অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত

একাদশ সংস্করণ
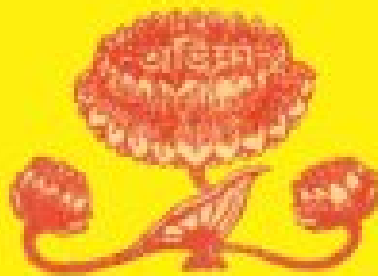
—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী (ইউ.পি.)

মূল্য ১.৫০ টাকা] [মাশুলাদি স্বতন্ত্র

ওঁ

কর্ম্মের পথে

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত

অর্থাৎ

বাংলা ১৩২৭ সনের পূর্ব্বে বিভিন্ন সময়ে লিখিত
পত্রাবলী হইতে সঙ্কলিত।

(মাত্র একটী লেখা কোনও প্রবন্ধ হইতে গৃহীত বলিয়া মনে হয়।)

একাদশ সংস্করণ, ১৩৮৩
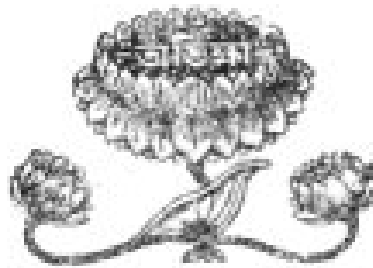
—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—
—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬।১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী (ইউ,পি)

মূল্য ১·৫০ দেড় টাকা] [মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অষ্টম সংস্করণের নিবেদন

পরমপূজ্যপাদ আচার্য্যপ্রবর অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত দেড়-আনা সংস্করণের ছয়খানা পুস্তিকা একত্র করিয়া "কর্ম্মের পথে—সপ্তম সংস্করণ" প্রকাশিত হইয়াছিল। ইতঃপূর্ব্বে উক্ত সবগুলি পুস্তিকারই বহু সংস্করণ হইয়া গিয়াছে, "কর্ম্মের পথের" ছয়টী সংস্করণ হইয়াছিল। "কর্ম্মের পথে" শ্রীশ্রীবাবামণির সকল গ্রন্থের অগ্রজন্মা।

এই গ্রন্থ প্রকাশ মাত্র দেশমধ্যে মহাসমাদর পাইয়াছিল। তাৎ-কালিক নিম্নোদ্ধৃত প্রশংসা-ভাষণ হইতেই তাহা অনুভূত হইবে।

'প্রবাসী' বলিয়াছিলেন,—"অন্তরের বাণী মহৎ, জলন্ত।"

'প্রবর্ত্তক' বলিয়াছিলেন,—"বক্তসার, শুদ্ধঃপূর্ণ, যেন মন্ত্রের মত নিরেট। তরুণ কর্ম্মীর হৃদয়ে শক্তি-সঞ্চারক। স্বামীজীর উপদেশ-গুলি মহামূল্য।"

'উদ্বোধন' বলিয়াছিলেন,—"জাতীয় তপস্যায় নিত্যপাঠ্য।"

'মানসী ও মর্ম্মবাণী' বলিয়াছিলেন,—"এই জীবন্ত উপদেশবাক্য-গুলি মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করিবে। দেশের কল্যাণ-সাধনোদ্দেশ্যে এই দুর্দ্দিনে সুপ্ত দেশবাসীর প্রকৃত অবস্থা ও চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই স্বামীজী এই জাগরণের সত্যবাণী প্রচার করিয়াছেন।"

'নায়ক' বলিয়াছিলেন,—"কোন পথে চলিলে মানুষ প্রকৃতই মানুষ হয়, স্বামিজী তাহা বজ্রগম্ভীর নাদে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার অগ্নিময়ী বাণী হতাশাক্লিষ্টের প্রাণে বিপুল উৎসাহের সঞ্চার করিয়া দেয়।"

'হিতবাদী' বলিয়াছিলেন,—"পাঠে হৃদয়ে বলের সঞ্চার হয়, আত্ম-বিস্মৃতি দূর হয়।"

শ্রীহট্টের 'জনশক্তি' বলিয়াছিলেন,—"এমন অর্থপূর্ণ বজ্রগম্ভীর বাণী প্রকৃত সাধক ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারেন না। প্রত্যেকটী বাক্য হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করে। জাতীয় উত্থানের দিন স্বামীজীর পুস্তিকাগুলি নিত্য-পাঠ্য।"

চন্দন-নগরের 'নবসঙ্ঘ' বলিয়াছেন,—"হৃদয়ে গেঁথে রাখবার উপযুক্ত।"

নদীয়ার 'বঙ্গরত্ন' বলিয়াছিলেন,—"শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব আমারই শ্রান্ত-ক্লান্ত দেশবাসীর মর্ম্মবেদনার ব্যথার ব্যথী—দেশের ত্রিতাপ-জর্জ্জর দেহে অমৃত-সিঞ্চনকারী দেশের ভাই। তাঁহার উপদেশ উপনিষদীয় বাণীর ন্যায়ই শ্রদ্ধেয়।"

ঋষিকল্প দার্শনিক স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর বলিয়াছেন,—"যে সুমহান আদর্শ প্রচারিত হইয়াছে, তদনুযায়ী চলা ভিন্ন দেশের কল্যাণের অপর কোনও পন্থা নাই।"

সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত বারীন্দ্র কুমার ঘোষ বলিয়াছিলেন,—"স্বামীজীর উপদেশ এতই সুন্দর ও তেজোগর্ভ যে, তাহার উপর আমার কোনও মতামত প্রকাশ করা ধৃষ্টতা মনে করি। প্রত্যেকটী কথা প্রাণে প্রাণে গাঁথিয়া রাখিবার উপযুক্ত।"

এই গ্রন্থ সুধী সমালোচকবর্গের শ্রদ্ধা ও প্রশংসা আকর্ষণ করিয়াছিল, মাত্র এতটুকু বলিলে ইহার সম্পর্কে অতি সামান্য মাত্র জ্ঞাতব্য বলা হয়। বাংলার স্বাধীনতা-কামী বিপ্লবী যুবকের দল

ইহাকে গীতার ন্যায় নিত্য-পাঠ্য বস্তুতে পরিণত করিয়াছিলেন। আমাদের সুস্পষ্ট স্মরণে আছে, একবার চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম প্রধান নায়ক শ্রীগণেশ চন্দ্র ঘোষ নিজে এক বিরাট বাণ্ডিল "কর্ম্মের পথে" কলিকাতা ১৩নং সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে চট্টগ্রাম নিয়া গিয়াছিলেন। পরে আমরা শুনিয়াছিলাম যে, সেই বার তিনি সঙ্গে করিয়া প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্রও কলিকাতা হইতে চট্টগ্রাম নিয়াছিলেন। "কর্ম্মের পথে"ও সেই যুগে আগ্নেয়াস্ত্রের ক্ষমতা ধারণ করিয়াছিল।

আমরা স্বর্গীয় দীনেশ চন্দ্র দেব গুপ্তকে চট্টগ্রামস্থ পাথরঘাটা আশ্রমে একবার পাঁচ হাজারের উপর "কর্ম্মের পথে" প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং শ্রীলোকনাথ বল, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এবং স্বয়ং সূর্য্য সেন (মাষ্টার দা) ইহা নিজ সঙ্ঘের কর্ম্মীদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। প্রথম ছয়টি সংস্করণে এই পুস্তিকা সম্ভবতঃ পঞ্চাশ হাজারের অধিক সংখ্যায় প্রচারিত হইয়াছিল।

"কর্ম্মের পথে" সম্পর্কে আমরা অনেক বিচিত্র দৃশ্য দেখিয়াছি। তাহার একটী এখানে বর্ণন অসঙ্গত মনে করি না। কলিকাতা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট দিয়া সিটি কলেজ ও রামমোহন রায় হোষ্টেলের কাছাকাছি স্থানে পূর্ব্বদিকের ফুটপাত দিয়া কয়েকজন লোককে খুব গাঁজাগাঁজি ভাবে দক্ষিণ দিক হইতে উত্তর মুখে আসিতে দেখা গেল। নিকটবর্ত্তী হইতেই দেখা গেল, অনুশীলন-সমিতির নায়ক পুলিন বিহারী দাস মহাশয় একখানা ক্ষুদ্র বহি পড়িতে পড়িতে পথ চলিতেছেন, তাঁহার অনুবর্ত্তী জন দশ বারো যুবক তাহা শুনিতে শুনিতে তাঁহাকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টন করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন। আরও সম্মুখে আসিয়া স্পষ্ট জানা গেল, ইহা স্বামী স্বরূপানন্দের "কর্ম্মের পথে।"

এই একটী দৃষ্টান্তই "কর্ম্মের পথের" অসামান্য প্রভাব সম্পর্কে যথেষ্ট মনে করি।

বিপ্লবী বাঙ্গালী যুবক একদিন ছয়টা পয়সা ব্যয় করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই, আর আজিকার বিশ্বপূজ্য অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব সেদিন অনশন-ক্লিষ্ট দগ্ধ জঠরকে চাপিয়া ধরিয়া চট্টগ্রাম, কলিকাতা, ঢাকার রাস্তায় ফেরী করিয়া ছয়পয়সা-সংস্করণের বহিগুলি বিক্রয় করিতে লজ্জা বোধ করেন নাই। পৃথিবীর ইতিহাসে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বনের মধ্য দিয়া একটী জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান নির্ম্মাণের গৌরব স্থাপন এই জন্যই সম্ভব হইয়াছে। "কর্ম্মের পথে" অযাচক আশ্রমের ভিত্তি-প্রস্তর।

বাংলা ১৩২৭ সনের ২৪শে শ্রাবণ "কর্ম্মের পথে" প্রথম সংস্করণ বাহির হয়। নিজে এই পুস্তক রাস্তায় রাস্তায় বিক্রয় করিয়া ক্ষুধার্ত্ত জঠরের অসামান্য ক্লেশ সবলে দাবাইয়া রাখিয়া ভিক্ষা ব্যতীত, চাঁদা না তুলিয়া, অমানুষ শ্রমে পরিশেষে আজ এক বিখ্যাত আশ্রম রচনা করিয়া স্বাবলম্বনের কীর্ত্তিধ্বজা শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসজী প্রোথিত করিয়াছেন।—প্রথম সংস্করণে এই পুস্তিকার মূল্য ছিল ছয় পয়সা। যে ক্ষুদ্র পুস্তিকাগুলি একত্র করিয়া পরিবর্দ্ধিত সপ্তম-সংস্করণ রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই কয়খানা গ্রন্থই "অযাচক আশ্রমের" প্রতিষ্ঠার মূলধন।

"কর্ম্মের পথে"র ইহা প্রকাশ্য ইতিহাস। কিন্তু "কর্ম্মের পথে"র ও তৎসঙ্গীয় ছয় পয়সা সংস্করণের অন্য ক্ষুদ্র কয়েকখানা পুস্তিকার মূল উৎস কি, তাহার সন্ধান বাহিরের জনসাধারণ জানেন না। যিনি গোপনপদসঞ্চারে সহস্র-যোজন-বিস্তৃত মাতৃভূমির আশা ও ভরসার

স্থূল নবযুবকগণের অন্তরের পথে যাতায়াত করিয়াছেন নিজের মর্ম্মবাণী লইয়া, তিনি সাহিত্যিক নহেন, প্রবন্ধকার নহেন, একজন পত্র-লেখক মাত্র। প্রবন্ধ-রচনা নহে, সাহিত্যগ্রন্থন নহে, ব্যক্তিগত ভাবে যুবক-মনের ভিতরে প্রবেশ করিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে তাহাদের কাছে চিন্তার খোরাক পরিবেশন করিবার কালে বাংলার এক মহাসংগঠনী-প্রচেষ্টার বিপ্লবাত্মক সন্ধিক্ষণে অজস্র পত্র-মুখে যে অভ্রান্ত অমোঘ অভয়বাণী চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, ইহা তাহার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশমাত্রের সংগ্রহ। এক একটা বিরাট বিরাট পত্রের দুই দশ পংক্তি মাত্র নিয়াই ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল। এক বিশাল ক্ষীরসমুদ্র একদা শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ-লেখনী-মুখে সৃষ্ট হইয়াছিল, "কর্ম্মের পথে" তাহার ইতস্ততঃ-বিকীর্ণ কয়েকটা ক্ষুদ্র শীকর-কণা মাত্র। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেই মহাসমুদ্র ইংরাজ রাজত্বকালে পুলিশের উৎপীড়নের মুখ হইতে নিজেকে বাঁচাইতে গিয়াই অন্তর্হিত হইয়াছে। বিগত ১৩৫৯ সালে কলিকাতায় যে "স্বরূপানন্দ-জন্মোৎসব" হইয়াছিল, তাহাতে প্রকাশ্য জনসভায় আমরা ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় মহাশয়কে বলিতে শুনিয়াছিলাম যে, "কর্ম্মের পথে"র কোনও কোনও কথা নাকি তাঁহার নিকটে লিখিত হইয়াছিল এবং সম্পূর্ণ ও মূল পত্রগুলি আর আজ পাওয়া সম্ভব নহে।

পূজ্যপাদ গ্রন্থকার অভিক্ষু সন্ন্যাসী। দেশকর্ম্মীর প্রশস্ত ললাটে পরমুখাপেক্ষিতার যে দুঃখদ কলঙ্করেখা অঙ্কিত রহিয়াছে, তিনি তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের রণবাহিনী পরিচালনা করিতেছেন। কাহারও দুয়ারে চাঁদার খাতা লইয়া তিনি ঘুরিয়া বেড়ান নাই, কাহারও

নিকটে কখনও একটী কপর্দ্দক মাত্র ভিক্ষা তিনি চাহেন নাই, অথচ মানভূমের অন্তর্গত, "পুপুন্‌কী আশ্রমের" একশত-বিঘা-ব্যাপী অরণ্য-ভূমি আজ অদৃশ্য হইয়াছে, পাথর-কাঁকরের দুঢ়তার দম্ভ আজ চূর্ণ হইয়াছে, সম্পূর্ণরূপে স্বাবলম্বনের উপরে দাঁড়াইয়াই আশ্রম চতুর্দ্দিকে তাহার বহুমুখ জন-সেবা-প্রয়াসকে পরিচালিত করিতেছে। আশ্রমের সনাতন ধর্ম্ম বাহুবল, এই ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই স্বামীজী স্বয়ং এবং তাঁহার ব্রহ্মচারী সহকর্ম্মীরা বীর-বিক্রমে গাতি-কোদাল চালাইয়াছেন এবং কোনও দিন কাঁচা ঝিঙ্গা চিবাইয়া, কোনও দিন ঢেঁড়শ পাতা সিদ্ধ করিয়া, কোনও দিন অখাদ্য তিক্ত-কটু-স্বাদ পলাশফুলের চর্চ্চরী রাঁধিয়া দৈনিক মোট সাড়ে পাঁচ পয়সার খোরাকীর বরাদ্দে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতঃ "অভিক্ষার" বৈজয়ন্তীকে বিজয়শ্রী-মণ্ডিত করিবার জন্য প্রাণপাত করিয়াছেন।

পুপুন্‌কী আশ্রম হইতে শত শত রুগ্নকে ঔষধ দান, সহস্র সহস্র কৃষককে কৃষিবীজ ও ফলকর বৃক্ষের চারা প্রদান, মানভূম-পল্লীর প্রস্তর মালা কাটিয়া পথ-নির্ম্মাণ প্রভৃতি করিয়াই শ্রীশ্রীস্বামীজীর অভিক্ষা-ব্রতের শক্তি নিঃশেষিত হইয়া যায় নাই, কাহারও নিকট চাঁদা না তুলিয়া নিজের স্কন্ধেই সমগ্র ব্যয়-ভারকে বহন করিয়া তিনি তাঁহার সেবা-হস্তকে ঢাকা, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, কাছাড়, ময়মনসিংহ, রংপুর, পাবনা, যশোহর, খুলনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বরিশাল, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, বালেশ্বর, কটক প্রভৃতি বহু জেলাতে প্রসারিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। শ্রীশ্রীস্বামীজীর বজ্রগর্ভ বক্তৃতাগুলি বহু তন্দ্রাচ্ছন্নের তন্দ্রা ভাঙ্গিয়াছে। নব্য-বাংলার অভ্যুদয়ের ইতিহাস দীর্ঘকাল একথা স্মরণ রাখিবে। যিনি জানিতে ইচ্ছুক, তিনি "অখণ্ড-সংহিতা বা

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের উপদেশ-বাণী" নামক বহু-খণ্ডে প্রকাশিত মহাগ্রন্থ হইতে তদ্বিষয়ে কিছু কিছু অবশ্যই অবগত হইতেছেন।

এই গ্রন্থের সপ্তম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া বহুকাল অপ্রাপ্য ছিল। আমরা সম্প্রতি ইহা অযাচক আশ্রমের মুখপত্র "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশিত করিয়া পাঁচ হাজার গ্রাহকের করতলগত এবং নির্ব্বাচিত অংশ-সমূহ ত্রিশ হাজার মুদ্রিত করিয়া শিবচতুর্দ্দশী উপলক্ষ্যে বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছি। আশা করি, এই অষ্টম সংস্করণও পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণের ন্যায় সমাদৃত হইবে।

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী-১

নিবেদক
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
স্নেহময় ব্রহ্মচারী

নবম সংস্করণের নিবেদন

দেশে আভ্যন্তরীণ চরিত্রের নিদারুণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আজ আর আদর্শবাদের মোহন-মুরলী ভারত-ব্রজের অধিবাসীদের প্রাণ কাড়িয়া নেয় না, ভারতবাসীর মন, প্রাণ, আত্মা অন্যত্র নিজেকে বিকাইয়া দিতে ব্যস্ত। তথাপি "কর্ম্মের পথে"র বেণুধ্বনির প্রয়োজন ফুরাইয়া যায় নাই। গ্রন্থের নবম সংস্করণের আত্মপ্রকাশ তাহার প্রমাণ। শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব বলিয়াছেন,—

"ভারতবর্ষ উঠিবে আবার,
জাগিবে আবার নিশ্চিত,
ক্ষণিকের এই পতন-দৃশ্যে,
চিত্ত আমার নয় ভীত।"

আষাঢ়, ১৩৭৬
অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী ১

কিমধিকমিতি
বিনীত নিবেদক
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়

ত্রয়োদশ সংস্করণের নিবেদন

১৩৮৬ বাংলার আশ্বিনে দ্বাদশ সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৩৯১র শ্রাবণে "কর্ম্মের পথের" ত্রয়োদশ সংস্করণ বাহির হইল। মাত্র ছয় হাজার পুস্তিকা মুদ্রিত হইল। শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রবর্ত্তিত দেশব্যাপী **"চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের"** পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় যে, আরও অধিক সংখ্যায় মুদ্রণ করা উচিত ছিল। কিন্তু কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা আমাদের সাধে বাদ সাধিয়াছে। ইতি—
শ্রাবণ, ১৩৯১

অযাচক আশ্রম,
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী-২২১০১০

বিনীত নিবেদক—
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়

ওঁ

কর্ম্মের পথে

দেশ কি চায়?

দেশ চায় মানুষ। যে মানুষ অশনি-আঘাতে নম্রশির হইয়া পড়িবেন না, যাঁহার তেজস্বিতা বিভীষিকা দেখিয়া ম্লান হইবে না, কাম-কলুষে জীবন-সাধনাকে যিনি বিসর্জ্জন দিবেন না,—দেশ চায় তেমন মানুষ। দেহ যাঁহার বজ্রের ন্যায়, বীর্য্য যাঁহার অপরিমেয়, মনুষ্যত্ব যাঁহার অভ্রভেদী, দেশ চায় তেমন মানুষ। দেশ চায় তাঁহাদের,—যাঁহাদের স্বজাতি-প্রীতির শান্তি-সিঞ্চনে দুঃখদগ্ধ দেশের অনন্ত দুর্ভাগ্য ঘুচিবে, যাঁহাদের কর্ম্ম-প্রেরণায় তোমরা আপন চিনিবে। দেশ চায় তোমাকে—জাগ্রত তোমাকে,—কর্ম্মঠ তোমাকে,—আত্মশক্তিতে চির-বিশ্বাস-পরায়ণ তোমাকে। স্বদেশ তোমার সাধনা চায়, তোমার তপস্যা চায়, পতিতের উত্থানলাভে তোমার আত্মোৎসর্গ চায়।

নীরব কর্ম্ম।

আত্মার উদ্ধারে আত্মাকে আহুতি দিতে হইবে আলোচনা-উন্মুখ শ্যেন-দৃষ্টির অতীতে রাখিয়া। ঘনশ্যাম কানন-কুঞ্জের নীরব গোপনতার নিভৃত আবরণে সহস্র দল মেলিয়া কুসুম ফুটিবে, কিন্তু তাহার দিব্য সৌরভে বিশ্ববাসীর সঙ্কোচ-সঙ্কীর্ণ

প্রাণটাকে উল্লাস-উচ্ছ্বাসে প্রশস্ত করিয়া দিতে সে ভুলিবে না। তেমনই গান গাহিতে চাহি, যে গান শুনিয়া সুপ্তিময় জাগিয়া উঠিবে, মুগ্ধ হইবে, কর্ম্মঘণার প্রচণ্ড তাড়নে ভাঙ্গিবে, গড়িবে, কিন্তু কে যে কোন্ গোপন পুরে বসিয়া রাগিণী আলাপ করিয়া গেল, তাহা অনুমানেও না জানিতে পারে।

প্রভুত্ব ও দাসত্ব

মানুষ মানুষের 'দাস' নয়, সে তাহার স্নেহানুলিপ্ত কনিষ্ঠ। মানুষ মানুষের 'প্রভু' নয়, সে তাহার শ্রদ্ধাভিষিক্ত জ্যেষ্ঠ। ভ্রাতায় ভ্রাতায় লঘু-গুরুর বিচার নাই, মনিব-গোলামের সম্বন্ধ নাই; একের হৃদয় অপরের হৃদয়কে অনুদিনই স্নেহের অনপনেয় বেষ্টনে আবরিয়া রহে।

মানুষের গৌরব।

তোমরা মানুষ, তোমাদের স্পর্দ্ধিত শির নমিত হইবে না কাহারও কাছে। তোমরা মানুষ, তোমাদের অমিত শক্তি কাহারও কাছ হইতে পরাজয়ের ম্লান অগৌরব লইয়া ফিরিয়া আসিবে না।

দেশের সেবা।

প্রাণ যদি চায় দেশের সেবা, পারি, না পারি, উহাতেই দেহ-মন সঁপিয়া দিব। প্রাণ যদি চায় মায়ের পূজা, সুমেরুর তুষারশৈল অতিক্রম করিয়া নন্দনের মন্দার আহরণে ছুটিয়া যাইব। প্রাণ যদি চায় দেশের কাজ, প্রবাল-মুক্তা কুড়াইয়া

আনিতে ভারতসমুদ্রের লোণা জলেই ডুবিয়া মরিব। কিন্তু আগে থাকিতেই বার বার শতবার ভাবিয়া দেখিব, নিজেকে উৎসর্গ করিয়া দিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকৃতই জাগিয়াছে কি না, অথবা উহা যশোলিপ্সার সাময়িক প্ররোচনা মাত্র। আকাঙ্ক্ষা যেন বিদ্যুতেরই মত উজ্জ্বল হয়, কিন্তু ক্ষণপ্রভা না হয়।

অকপট হও।

কাজই যদি করিতে হয়, পুরুষের মত করিও; কথাই যদি বলিতে হয়, মানুষের মত বলিও। বুক ফুলাইয়া যদি প্রাণের কথা বলিতে না পার, তবে নিঃশব্দ থাকিও। দণ্ড-পুরস্কারকে যদি অগ্রাহ্য করিতে না পার, কাজে হাত দিও না। কথায় অকপট হও, কার্য্যে অকপট হও। মিথ্যা বীরত্বে অথবা সাহসের ভাণে দিগ্বিজয় হয় না।

আদর্শ।

আদর্শ থাকিবে উজ্জ্বল, নিষ্কলঙ্ক, নির্দ্দোষ। আদর্শ থাকিবে এমন, যাহাকে লাভ করিতে যাইয়া মরিতেও শোক আসিবে না, দুঃখ আসিবে না, ভয়-ত্রাস প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

কেমন দুঃখ চাই।

দেশেরই যদি কাজ করিতে চাও, স্বার্থকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিলে চলিবে না। সুখেরই যদি অধিকারী হইতে চাও, দুঃখকে বরণ করিতেই হইবে। কিন্তু যে দুঃখ নিমেষে

আসে, নিমেষে যায়, সে দুঃখ আমার নয়। যে দুঃখ এক ফোঁটা অশ্রুসলিলে, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসে ফুরাইয়া যায়, সে দুঃখ আমার নয়। যে দুঃখ মানব-সভ্যতার বুকে ভৃগুপদ-চিহ্ন আঁকিয়া দিল না, সে আবার একটা দুঃখ কি ? দুঃখ পাইব তেমন, যাহা দু-চার জন্ম বুকের উপরে ক্ষতের চিহ্ন রাখিয়া যাইবে। আঘাত পাইব তেমন, যাহা হৃদয়-শোণিতের রক্তিম স্রাবে বিশ্ব-সুখের মন্দাকিনী বহাইবে ; সন্ধ্যামন্ত্র পড়িবার কালে যেন বেদনিষ্ঠ সাম-ব্রহ্মচারী জাহ্নবী-যমুনার তীর্থ-সলিলকে আহ্বান না করিয়া আমার এই ব্যথার মন্দাকিনীকেই ডাকিয়া আনে।

নেতা কে ?

বিশ্বের নেতৃত্ব যিনি গ্রহণ করিবেন, তিনি তোমাদের আমাদের মতই সাধারণ মানুষ, শুধু আত্মোৎসর্গের প্রচণ্ড চেষ্টার মধ্য দিয়া তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবেন। * * * পতিতোদ্ধার যাহার জীবনের ব্রত নয়, জন-সেবার যূপকাষ্ঠে সকল স্বার্থকে যে বলি দেয় নাই, লাঞ্ছিতের বিষণ্ণ বয়ানে,—নিরন্নের বিদগ্ধ জঠরে,—আহতের শোণিত-স্রাবে নিজের অস্তিত্বকে যে জন সর্ব্বময় দেখে নাই, তাহাকে নেতা বলিয়া মানিব না।

বাধা-বিঘ্নের আবশ্যকতা।

কোমল জিনিষকে ঘাতসহ করিতে হইলে তাহাতে আঘাত দিতে হয়। জীবনকে দৃঢ় করিতে হইলে বিকাশের পরিপন্থী

শক্তি আবশ্যক। লোহা আগুনে পুড়িয়া ইস্পাত হয়, বালুকারাশি বায়ুর চাপে পাথর হয়, জল শৈত্যের প্রকোপে নিক্ষেপযোগ্য আকার পায়। যেখানে চাপ নাই, সেখানে মাটি শক্ত হইবে কেন? যেখানে বাধা নাই, সেখানে জীবনই বা কর্ম্মক্ষম হইবে কেন? উত্থান-পতন লইয়াই জীবন, আর উত্থান-পতনের মধ্য দিয়াই জীবন ফুটিয়া উঠিবে।

আশার বাণী।

আজিকার এই দুঃখ কিন্তু প্রকৃতই দুঃখ নয় বরং ইহা অনন্ত সৌভাগ্যের উন্মুক্ত দান-স্বরূপ। আজ যাহা তোমার ক্ষণ-ভঙ্গুর মান-অভিমানে আঘাত হানিতেছে, তাহাই তোমার অক্ষয় সম্ভ্রমকে জাগ্রত করিবে। আজ যাহা তোমার নিরপরাধ প্রাণকে শতধা খণ্ড করিয়া ফেলিতেছে, তাহাই যে আবার উহাকে অখণ্ড গরিমায় মণ্ডিত করিবে। আজ যাহা অবসাদ আনিতেছে, কাল তাহা আত্মপ্রসাদ দিবে।

যথার্থ আভিজাত্য।

বংশ-মর্য্যাদায় বিশ্বাস করিও না; কীর্ত্তিমান্ পূর্ব্বপুরুষের অতীত গৌরব ধূলি-লুণ্ঠিত বর্ত্তমানকে কৌলীন্য দেয় না। তুমি সম্ভ্রান্ত—তোমার অতীত লইয়া নয়, তোমার জাগ্রত জীবন্ত বর্ত্তমান লইয়া,—তোমার স্বাবলম্বন ও স্বয়ম্প্রতিষ্ঠা দিয়া। তোমার জীবনের উন্নত লক্ষ্য, কর্ম্মের অটুট একনিষ্ঠা, চিত্তের বিশাল উদারতাই তোমার আভিজাত্যের নির্দ্দেশ করিবে।

স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ।

এমন নির্দ্দোষ আদর্শে ইহাদিগকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, যেন ইহাদের সন্তান হইয়া আমরা ধন্য মানিতে পারি, জগতের মহাপ্রদর্শনীতে স্ফীত বক্ষে দাঁড়াইতে পারি। আমরা যেন তেমনই তেজস্বিনী জননীর সন্তানরূপে জন্ম-পরিগ্রহ করিতে পারি, যাঁহাদের মর্ম্মভেদী অক্ষি-দীপ্তি সকল নীচতাকে ভস্মসাৎ করিয়া দেয়, যাঁহাদের কনিষ্ঠাঙ্গুলির ক্ষুদ্র ইঙ্গিতে বন্যার জল থমকিয়া দাঁড়ায়, যাঁহাদের চরণ-রেণু স্পর্শ করিয়া মহাপাতকী তরিয়া যায়।

ব্রহ্মচর্য্য।

ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা ব্যতীত দেশের দুর্দ্দশা-মোচন অসম্ভব। যাহাদের ব্রহ্মচর্য্য নাই, তাহাদের নেতৃত্বে আস্থা রাখিও না। প্রকৃতই যদি স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণকামী হও, নিজ নিজ জীবনে সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস কর এবং সেই নিয়ম-নিষ্ঠার ভাব সর্ব্বত্র সংক্রামিত করিয়া দাও। জীবন যাহার ব্রহ্মচর্য্য-পুষ্ট, তাহারই ইচ্ছাশক্তির প্রচণ্ড প্রভাবে প্রাণে প্রাণে কর্ম্মানুরাগের বজ্র-বিদ্যুৎ খেলিতে থাকে।

ব্যর্থ শিক্ষা।

যে শিক্ষা আত্ম-সম্ভ্রমকে জাগাইল না, সে শিক্ষা কুশিক্ষা। যে শিক্ষা স্বতন্ত্র বুদ্ধির বিকাশ দিল না, সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ। যে শিক্ষা পরমুখ-প্রেক্ষিতা ঘুচাইল না, সে শিক্ষা ব্যর্থ।

বীর কে?

তিনিই প্রকৃত বীর, শত্রুর উদ্যত অসির নিম্নে দাঁড়াইয়াও যিনি বজ্রকণ্ঠে সত্যেরই বিজয় ঘোষণা করেন ; তিনিই প্রকৃত বীর, অভাবের দুঃসহ পেষণের মধ্যেও যিনি পরহিতে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে পারেন। নির্জ্জনে যাঁহার সংযম টুটে না, প্রশংসা যাঁহাকে স্ফীত করে না, লোক-নিন্দা যাঁহাকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না, বাধা যাহাকে হতাশা দেয় না, তিনিই বীর—তিনিই পূজ্য।

কে বেশী শক্তিমান্?

সম্রাট-শক্তি প্রজা-শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে, কিন্তু সংযম-শক্তির কাছে সম্রাট-শক্তিও অবনত হয়।

বীরভোগ্যা বসুন্ধরা

আলস্য না করিলে লক্ষ্মীর আবির্ভাবের জন্য কোষ্ঠীর লিখিত গ্রহ-নক্ষত্রের আশায় বসিয়া থাকিতে হয় না। অনলস কর্ম্ম করিয়া ইংরেজ-মাড়োয়ারী বড় হয়, লক্ষ্মী কিনিয়া আনে, আর আমাদেরই কেবল ফুল-বেলপাতার প্রয়োজন হয়। যেদিন অবধি চেষ্টা, কর্ম্ম ও আলস্যশূন্যতা দূর হইয়া লক্ষ্মীর পূজায় ফুলবেলপাতা ঢুকিয়াছে, সেই দিন হইতেই মা লক্ষ্মী অন্তর্হিত হইয়াছেন বা ফুল-বেলপাতা, ধান-দূর্ব্বা, কচু-ঘেচুর চাপায় পড়িয়া মরিয়া আছেন।

জীব-সেবা।

জীবসেবা,—সে কি সোজা কথা রে ভাই? কাঁটা ফুটিয়া চরণতল রুধিরাক্ত হইবে, হাসির কমল ফুটিয়া উঠিবে, তবে ত! আঁখির জলে হাসি উছলিবে, তবে ত! অসহ যাতনার তরঙ্গে তরঙ্গে আনন্দ নৃত্য করিবে! যিনি সকল আনন্দের প্রবর্ত্তক, তাঁহাকে দুঃখে দেখা চাই, দৈন্যে দেখা চাই, তবে তোর জীব-সেবা—নর-নারায়ণের পূজা সার্থক হইয়া উঠিবে।

ত্যাগের মহিমা।

যাঁহারা সর্ব্বত্যাগী নিঃস্বার্থ পুরুষ, তাঁহাদেরই অস্থিখণ্ডে বজ্রনির্ম্মাণ হয়। যথা,—দধীচি।

পরমপিতার আশীর্ব্বাণী।

যে দেশের লোক নিজের দেশকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, ভগবানের আশীর্ব্বাদ স্নিগ্ধ ধারায় সে দেশে নামিয়া আসে। স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমিকে যদি শ্রদ্ধা কর, ভগবৎ-কৃপা আরতির আলোকের মত সমগ্র দেশ ছাইয়া ফেলিবে। স্বদেশ-প্রেমিকের ত্যাগের প্রভাবে তাঁহার করুণার সিংহাসন টলিয়া যায়, সাফল্যের অমূল্য স্বরূপে তিনি দেশবৎসলকে ধন্য করিতে ছুটিয়া আসেন।

অভিনয় চাই না।

আমরা যা' চাই, তা' ব্রহ্মচর্য্যের "অভিনয়" নয়, আমরা চাই, ব্রহ্মচর্য্যের অভ্যাস। শুধু অভিনয় করিলেই যদি দেশের

উদ্ধার হ'ত, তবে বক্তারাই দেশটাকে উদ্ধার ক'রে ফেলত। কপটতা দিয়েই যদি কল্যাণ হ'ত, তবে আজ ভারতের চুয়ান্ন লক্ষ গেরুয়াওয়ালা থাকৃতে দেশের লোক দুঃখে আধমরা হ'য়ে থাকৃত না।

ভয় কি?

অগ্নি-পরীক্ষায় পড়িয়াছ বলিয়া তোমার জীবন কি বাস্তবিকই দুঃসহ? অমৃতের আস্বাদনে অমর হইবে,—এ ভরসা যাহার আছে, শতবারও কি সে নির্ভয়ে মৃত্যুর বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়ে না? মায়ের কোলে বসিতে পারিব, একথা ভাবিয়া দুর্ব্বল শিশুও কি আছাড় পড়িতে পড়িতে জননীর কাছে ছুটিয়া যায় না?

কেমন কর্ম্মী চাই?

যিনি গরু-গাধার কাছ হইতেও কাজ আদায় করিতে পারিবেন, আমি চাই তেমন কর্ম্মী। নিজে একা খাটিয়া যিনি জীবনপাত করিবেন, লৌকিক প্রতিষ্ঠাকে চাহিবেন না, মৃত্যুকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনিবেন না, তেমন কর্ম্মী দেশের গৌরব, জাতির শ্লাঘা সন্দেহ নাই; কিন্তু যিনি নিজের কর্ম্মাকাঙ্ক্ষা ও কর্ম্ম-সামর্থ্যকে জড় প্রস্তরখণ্ডের মধ্যেও সংক্রামিত করিয়া দিয়া তাহাকে জীবন্ত করিয়া তুলিবেন, আজ চাই কর্ম্মিকুল-চূড়ামণি সেই মহাকর্ম্মীকে। আদর্শের পায়ে জীবন বিকাইয়া দিয়া যিনি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা ভুলিয়াছেন, হিতাহিত বিস্মৃত হইয়াছেন, সুখদুঃখ-বোধ

হারাইয়াছেন, তাঁহাকে ত' আজ চাই ; কিন্তু যিনি নিজের অদম্য প্রেরণার সঞ্চারণা শতদিকে ছড়াইয়া দিয়া আলস্য-নিথর মোহ-তন্দ্রিত লক্ষ কোটির মেরুদণ্ডের বিপুল-ভার-বহনের ক্ষমতা অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন এবং একই আদর্শের জন্য যুগে যুগে অগণিত মানব-সন্তানকে পরম্পরাক্রমে আত্মদান করার জন্য অশরীরী ইচ্ছার প্রভাবেই প্রবুদ্ধ করিতে থাকিবেন, তেমন মহামানবকে আমি আরও বেশী করিয়া চাই। যাহার জীবনের ত্যাগ অনাগত মানবকুলকে ত্যাগের পথে টানিয়া আনিবে, যাহার জীবনের সহিষ্ণুতা অনাগত কর্ম্মিচমূর পৃষ্ঠবংশ শক্ত করিবে, যাহার বিপুল দুঃখ-দহন মানব-মনের মধ্য হইতে মৃত্যুর বিভীষিকাকে মুছিয়া লইয়া যাইবে, আজ যে তাঁহাকেই চাহি। বাহুতে বজ্রের শক্তি লইয়া, মনে ঋষির সংযম লইয়া, হৃদয়ে বাত্যার সাহস লইয়া জগতের অকল্যাণ ধ্বংসের মহাব্রত উদ্‌যাপনে যাঁহারা একাই ছুটিয়া আসিবেন না, পরন্তু নির্ব্বোধের বুদ্ধিকে কুশাগ্র করিয়া, অধোগতের চিত্তকে ঊর্দ্ধশীর্ষ করিয়া, বিক্ষিপ্তের কর্ম্ম-প্রেরণাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া, অবসাদ-খিন্নের আকাঙ্ক্ষাকে উদ্দীপ্ত করিয়া নিখিল জগৎকে আত্মোৎসর্গের মহামহোৎসবে ডাকিয়া আনিবেন, তেমন কর্ম্মী চাই।

সংগ্রাম নিত্য।

মুহূর্ত্তের সফলতায় মনে করিও না, জীবনাকাশের সকল মেঘ চিরতরে কাটিয়া গিয়াছে। যত বড় সফলতাই আজ লাভ

করিয়া থাক না কেন, মহত্তর সফলতার জন্য তোমাকে পুনরায় প্রস্তুত হইতে হইবে, বৃহত্তর বাধাসমূহ লঙ্ঘন করিবার জন্য তোমাকে কোমর বাঁধিতে হইবে। একটা ঝড়ে নৌকা বাঁচাইয়া লইয়াছ ত' বেশী কি করিয়াছ? ঐ দেখ, চারিদিক অন্ধকার করিয়া পুনরায় মেঘ ঘনাইয়া আসিল, ঐ দেখ, দেখিতে না দেখিতে অশান্ত সমুদ্রের ক্ষুব্ধ সলিলে প্রলয়ের তাণ্ডব-নর্ত্তন আরম্ভ হইয়া গেল—মাঝি আজ শক্ত করিয়া হাল ধর, আজ তুমি আত্মবিশ্বাস হারাইয়া অক্ষমের দুর্ব্বল ক্রন্দন কাঁদিও না, আজ তুমি হাহাকারে টলিয়া পড়িয়া ডুবিয়া মরিও না, তোমারই প্রবল একনিষ্ঠা যে ঝঞ্ঝার পরাক্রমকে পরাহত করিবে, এই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া আজ বীরের মত বুক ফুলাইয়া নৌ-চালনা কর, প্রচণ্ড পৌরুষ তোমাকে বাঁচাইবার সামর্থ্য দান করিবে। দলে দলে যাত্রী তুমি আজ পার করিয়া লইয়া চলিয়াছ, তুমি আজ নেতা, তুমি আজ পারের কর্ত্তা, আজ তুমি নিজের উপর নির্ভর না করিয়া ঐ ক্ষণকাতর, ক্ষণসুখী, দুর্ব্বলেন্দ্রিয়, দুর্ব্বলহৃদয় গড্ডলিকা-প্রবাহের ন্যায় নিদ্রিত-বিচারবুদ্ধি জন-সঙ্ঘের ভক্তিহীন জনমতের মুখ চাহিয়া থাকিও না। ইহাদেরই জন্য তুমি জীবনদান করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছ, একথা ইহারা যদি না বুঝিয়া বাধাও দিতে আসে, তথাপি সে দিকে কর্ণপাত করিও না। চালাও নৌকা, চালাও, তীরবেগে চালাও। সকল পবন-গর্জ্জন, সকল তরঙ্গাক্রোশ

তুচ্ছ করিয়া তীরবেগে জীর্ণ তরণীখানা ছুটাইয়া লইয়া চল, ঐ যে দেখা যায় সোণার দেশ, বজ্র-বিদ্যুতের ক্ষণিক আলোকে ঐ যে দেখা যায় সবুজ তীরভূমি, ঐ যে দেখা যায় সুখ-সঙ্গীতের স্বপ্ন-লহরী-ঘেরা চিরানন্দ-নিকেতন, তোমার তপঃসাধনলব্ধ ব্রহ্মবীর্য্যপ্রভাবে এ ভগ্নতরী সেইখানে লইয়া চল। কিন্তু ঝড় থামিয়া গেল। থামুক, ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। ঝড় থামিয়াছে বলিয়াই যে তোমার অবসরের সময় আসিয়াছে, তাহা মনে করিও না। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও বাড়া বাঁধিবে, তোমাকে স্থির সমুদ্রেও অলস রহিলে চলিবে না।

বধির হও, উপেক্ষা কর।

সমালোচনায় বধির হও, নিন্দাবাদ উপেক্ষা কর, আর অমিতবিক্রমে কেশরি-নির্ঘোষে জগৎ কাঁপাইয়া কর্ত্তব্যের গহন-কঠোর পথে অগ্রসর হও; ঘেউ ঘেউ করিবার জন্য কুক্কুরের অভাব কখনও হইবে না, ছিদ্রান্বেষণ করিবার জন্য শৃগালের অপ্রাচুর্য্য কখনও হয় না। মক্ষিকা ব্রণের অন্বেষণ করিবেই। তুমি সে সব গ্রাহ্যে আনিও না, দৃক্‌পাত করিও না, ধীরচিত্তে দ্রুতপদক্ষেপে প্রশান্ত হৃদয়ে সোৎসাহ প্রাণে সোজাসুজি লক্ষ্য-পথে চলিতে থাক। সকলকে খুশী করিয়া সকলকে সান্ত্বনা দিয়া এজগতে কোনও কাজ হইতে পারে না, হইবেও না। সকলের হাতে হাত দিয়া কেহ পথ চলিতে পারে না,—কাহারও কাণেও ধরিতে হয়, কাহাকে কাহাকে এড়াইয়াও

যাইতে হয়। তুমি যখন স্বার্থের পায়ে জগতের কল্যাণকে বলি দাও, তখন যেমন একদিক হইতে ধিক্কারধ্বনি উত্থিত হয়, তুমি যখন পরার্থের পায়ে নিজের কাঁচা মাথাটা কাটিয়া দাও, তখনও তেমন আর একদিক হইতে নিন্দার নির্ঝর শতমুখে প্রবাহিত হয়। এ জগতে নিন্দা ও লাঞ্ছনা কে না পাইয়াছেন? যীশুর কি নিন্দুকের অভাব ছিল? বুদ্ধদেব কি কুৎসা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন? কবীরের নামে কি অপবাদের ফুলঝুরি হাটবাজারের কুৎসাসুখী নরনারীর চিত্তবিনোদন করে নাই? শ্রীগৌরাঙ্গের ন্যায় নির্ব্বিরোধ প্রেমাবতারের কি বিরুদ্ধবাদী ছিল না? কর্ম্মযোগীদিগকে ছাড়িয়াই দাও। যাঁহারা দেশ ভুলিয়া, বর্ণ ভুলিয়া, সমাজ ভুলিয়া, সংসার ভুলিয়া, সকল বিরোধের অতীত লোকে ভূমানন্দের আস্বাদনে ডুবিয়াছিলেন, সেই সকল ঈশ্বরকল্প মহাপুরুষগণেরই যখন অপ্রশংসার অভাব ছিল না, তখন নিন্দা-প্রশংসাকে শূকর-বিষ্ঠাবৎ উপেক্ষাই করিতে হইবে। হয়ত বিশ্ববাসীর অভিনন্দন-মালা তোমার কণ্ঠ-লগ্ন হইবে, হয়ত বা নিন্দার শূলে চাপাইয়া তিল তিল করিয়া তোমাকে হতচেতন ও গতজীবন করা হইবে, কিন্তু গ্রাহ্য করিও না, পিছনে ফিরিয়াও চাহিও না, সকল কথায় বধির হও, সকল বাধায় উপেক্ষা কর, অগ্রসর হও, নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিয়া জগতের জন্য আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া যাও।

কিসের পরাজয়?

প্রলোভনের সহিত যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ, একথা মুখেও আনিও না। তুমি যে পরাজিত হইয়াছ, একথা স্বীকার করিও না, বরং অকম্পিত কণ্ঠে বলিয়া ওঠ, মরিতে মরিতেও তুমি বাঁচিয়া উঠিবে, পড়িতে পড়িতেও তুমি উঠিয়া দাঁড়াইবে। জীবনের পিচ্ছিল পথে চলিতে চলিতে দুই চারিবার পথচ্যুতি কাহার না হয়, দুই চারিবার ভ্রমত্রুটী কে না করে? অনন্ত-উন্মেষশীল বিরাট মনুষ্য-জীবনে তুচ্ছ দুইটা পরাভবের স্থায়িত্ব আর কতটুকু? নিজেকে বিশ্বাস কর। অহংকার করিয়া বল, প্রলোভন তোমার ক্রীতদাস—কথায় ওঠে, কথায় বসে। প্রলোভন তোমার কি করিতে পারে? সর্ব্বাঙ্গ কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে ত' ভারী হইয়াছে। শরণাগতির জাহ্নবী-প্রবাহে অবগাহন করিয়া সকল কর্দ্দম ধৌত করিয়া লও। সৎসাহসের ঝঞ্ঝাবাত্যায় সকল সঙ্কোচ ও সঙ্কীর্ণতাকে উড়াইয়া দিয়া মেরুদণ্ড সোজা করিয়া দাঁড়াও। আর একবার ভাল করিয়া নিজের জীবনৈকলক্ষ্যের অনুধাবনা করিয়া লও, আর একবার ভাবিয়া বুঝিয়া দেখ,—তুমি কে, তোমার কর্ত্তব্য কি, তোমার জীবন-সাধনার সিদ্ধি কিসে? অতীতের সকল দুঃখকরী স্মৃতি পদতলে চাপিয়া মারিয়া ফেল, আর জ্বলন্ত বিশ্বাসে আত্মনির্ভর করিয়া ভবিষ্যতের গৌরব-দীপ্ত চিত্রে বিমুগ্ধ হইয়া পতঙ্গেরই মত উচ্চাকাঙ্ক্ষার অনলকুণ্ডে আত্মবিসর্জ্জন কর। সেই আগুনে

পুড়িয়া পুড়িয়া সকল পরাজয় তোমাকে পরিত্যাগ করিবে, কারণ, যুদ্ধজয়ই যাহার পণ, মৃত্যুও তাহাকে পরাজিত করিতে পারে না।

পরমুখ-পানে তাকাইও না।

চিরকালই কি পরের মুখে ঝাল খাইবে? তোমাদের পুতুল-জন্ম ঘুচিবে কবে? প্রতিপাদবিক্ষেপে পরেরই বুদ্ধি চাহিয়াছ, বিপদে আপদে পরেরই প্রত্যাশা করিয়াছ, কিন্তু তোমাদের হৃদয়ের মণিময় সিংহাসনে যে দেবতা আপন প্রভায় সকল সংশয় ও সন্দেহের নিরসন করিয়া নীরবে বহুকাল বহু যুগ-যুগান্তর ধরিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার কাছে কথাটি জিজ্ঞাসা কর নাই। ভিত্তির উপরে নির্ভর না করিয়া ছাদের ভরসা করিয়াছিলে।

সাধনা চাই।

সিদ্ধি-লাভে সাধনা চাই। কাঁটা না ফুটিলে কমল মিলে না, খনি না খুঁড়িলে রত্নরাজি আপনা হইতেই উঠিয়া আসে না। সাধকেরা বলিয়াছেন, মুক্তির পথ কুসুমাস্তীর্ণ নহে, উহা ক্ষুরের ধারার মত শাণিত ও দুর্গম। বিনা বাতাসে গাছের পাতাও নড়ে না, পথের ধূলিও উড়ে না, বিনা চেষ্টায় তুমি পূর্ণতা লাভ কি করিয়া করিবে? পরিশ্রম না করিলে পারিশ্রমিক কিরূপে মিলিবে? আলস্যের জন্য জগতে কোনও পুরস্কার নাই।

ভাবুকতা ও ভাব-প্রবণতা।

ভাবকে অগভীর রাখিয়া কর্ম্ম করিতে চাহিলে তাহা ত'

পঙ্গু হইবেই। সবই বিফল হইবে শুধু ভাবুকতারই অভাবে। নিমেষের মধ্যে শত শতাব্দীর আড়ষ্ট জড়তা পরিহার করিয়া অভাবনীয় কর্ম্মনৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারি, কিন্তু তাহাকে স্থায়ী করা চাই। তবে ত' সফলতা! উত্তেজনা, উন্মাদনা যথেষ্ট দেখাইতে পারি, কিন্তু ঝড়ের মত আসিয়া উহা ঝড়ের মতই চলিয়া গেলে কোন্ লভ্য করায়ত্ত হইবে? বরুণের বর্ষণের মত বাক্যবৃষ্টি করিতে পারি, ভূতোন্মত্তের মত আমরা নিঃশঙ্কও হইতে পারি, কিন্তু যাহা করিলে এই বৃষ্টিধারাকে চিরতরে হৃদয়ে ধরিয়া রাখা যায়, এই নির্ভীকতা দীর্ঘায়ু হয়, তাহা ত' করিতে হইবে! বর্ষার উদ্দাম প্লাবনে কীর্ত্তিনাশার উচ্ছ্বসিত জল-প্রবাহ যেমন করিয়া শত শাখা-প্রশাখায় সাগরে যাইয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে, তেমনি আবেগে কার্য্যারম্ভ করিতে পারি কিন্তু কার্ত্তিকের অভ্যুদয়ে সেই উচ্ছ্বসিত নদী যেমন ক্ষীণস্রোতা অল্প-তোয়া হয়, আমরাও তেমন দুটা দিন যাইতে না যাইতেই ক্ষীণোদ্যম, ভগ্নোৎসাহ, হতাশাহত হইয়া পড়িলে চলিবে কি? আমাদের সাহসিকতা, আমাদের দুর্দ্দমতা সকলের নয়নে বিস্ময় উদ্রিক্ত করিতে পারে কিন্তু সে বিস্ময়কে অমর হইতে দেওয়া ত' চাই। ভূতগ্রস্ত ব্যক্তির অঙ্গক্ষেপ ও উল্লম্ফন যেমন হিতাহিত-বিবেচনা-বর্জ্জিত, আমরাও তেমন ভয়াবহ সাহসে নির্ভর পাইয়া অনায়াসে খঞ্জপদেই গিরি লঙ্ঘন করিতে পারি, কিন্তু প্রেতাত্মা আবিষ্টকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলে যেমন তীব্র

ক্লান্তি, অবসাদ ও আলস্যকেই রাখিয়া যায়, তেমন যদি আমাদের প্রচণ্ড প্রচেষ্টার পদাঙ্ক-স্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়া যায় শুধু নিরুৎসাহ-কাতরতা, আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস এবং কর্ত্তব্য-কর্ম্মে ঘোরতর ঔদাসীন্য, তবে তাহাতে কি ফল হইল ? যে কর্ম্ম-চাঞ্চল্য আমার অদূর অতীতকে সমৃদ্ধ করিয়াছে, তাহাকে যদি অব্যাহত রাখিতে পারি, তাহা হইলে, যে ভবিষ্যৎ আজ কল্পনার সুদূরে কুজ্ঝটিকার ছায়াবরণে অস্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে, তাহাই বাস্তবের কিরণ-সম্পাতে স্পষ্ট হইবে, প্রত্যক্ষ হইবে—যাহা অসম্ভাবনার গভীর গহ্বরে ডুবিয়া আছে, তাহাই সম্ভব হইবে, সাধ্য হইবে, সন্নিকট হইয়া দাঁড়াইবে।—আমি উচ্ছ্বাসের অপ্রশংসা করিতেছি না, শুধু উহার অপূর্ণতার দিক্‌টাই তোমাকে দেখাইতেছি। উচ্ছ্বাস ভাবের পরিণত অবস্থার প্রকাশ নহে। ভাব-প্রবণতা ভাবের ক্ষণচঞ্চলা, মুখরা, কিশোরী-মূর্ত্তি; ভাবুকতা তাহার পরিপূর্ণ-লাবণ্য-মণ্ডিত ঢলঢল যৌবন।

প্রকৃত কবি।

কথার কবিতা আর চাহি না; পার ত' কর্ম্মের কবিতা রচনা কর, অনন্ত অনাগত ব্যাপিয়া যাহা বিশ্বমানবের সম্ভোগ্য রহিবে। বাক্যের ব্যবসায় করিয়া করিয়া অনেকেই নাম করিয়াছে; কিন্তু মানুষের যে প্রকৃত জীবন, উহা ত' আর বাক্যই নহে যে, উহারই উৎকর্ষে জীবন সার্থক হইয়া যাইবে। পুঞ্জীকৃত কথার বিন্ধ্যাগিরি তোমার প্রজ্জ্বলিত জীবন-বহ্নি

নির্ব্বাপিত করিতে পারে কি? তাহার জন্য খাদ্য চাই, কথা নয়, কথা নয়। অন্ধকারে আলোকই চাই, কথা নয়, কথা নয়। দেশ ও জাতির দুঃখ, দৈন্য, দুর্গত দশা দূর করিতে কর্ম্মের কল-কোলাহল চাই, কথার কলহ নয়।—কবি চাই; কিন্তু সে কবি যেন চ'খের জলে, দেহের ঘামে, বুকের রক্তে ইতিহাসের পাতায় পাতায় কবিতা লিখিয়া যায়। পরের দুঃখে প্রকৃতই যার আঁখির সলিল না ঝরিয়াছে, তাহাকে বলিব কবি? না, না, সে কবি নহে। হইতে পারে সে জালিয়াত, হইতে পারে সে যাদুকর, সে কবি নহে। লক্ষ বাধাকে লঙ্ঘিতে গিয়া দারুণ দুঃখ যে না পাইয়াছে, সে কবি নহে। জীবনাদর্শ সফল করিতে গিয়া বক্ষশোণিতে যে পিতৃ-তর্পণ না করিয়াছে, সে কবি নহে। জানিও, নিখিল ভুবনে সকলের তরে সুগভীর অনুভূতি, লক্ষ বিঘ্নে বিপুল বাধায় নির্ভীক শ্রমবল, বহুজনহিতে বহুজনসুখে নীরব আত্মাহুতি,—কাব্যের ইহা প্রাণ।

সার্থক দুঃখ।

দুঃখ আমরা জীবনে অনেক সহি। কিন্তু সেইটুকু যদি পদ্ধতি-ক্রমে একটা গরীয়ান্ আদর্শকে লাভ করিতে যাইয়া সহ্য করি, তাহা হইলে জীবনটা সার্থক হইয়া যায়।

আঘাতের প্রতিঘাত।

পরকে যাহারা দুঃখ দিয়াছে, নিজের দুঃখে তাহারা কাঁদিবে। প্রাণ ভরিয়া মজা মারিয়া মানুষকে যে অবমাননা

করিয়াছে, সে অপমান আবার যে তোমাদের নিজেদের কাছেই সহস্রগুণে ফিরিয়া আসিবে না, অমন ভাবিও না।

সঙ্ঘ।

দশের দশবিধ বৈচিত্র্য একটি সাধারণ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা পাইয়া শত মঞ্জুলতায় সুন্দর হইয়া একটী সঙ্ঘ গড়িয়া তোলে। দশের দশবিধ সামর্থ্য একই সাধারণ লক্ষ্যে প্রযোজিত হইয়া দশভুজার দীপ্ত সায়কে পরিণত হয় এবং দৈন্যকে দলিত করিয়া, হীনতাকে শত-ছিন্ন করিয়া, সঙ্ঘের মধ্যে প্রাণশক্তির আমন্ত্রণ করে।

ভ্রাতৃত্বের জাগরণ।

ভ্রাতায় ভ্রাতায় ভ্রাতৃত্বের অমর সম্বন্ধকে আর অস্বীকার করিয়া রহিলে চলিবে না। বলিতে হইবে,—"ওরে তোরা কে আছিস দুর্ব্বল, আমার বাহুর ছায়ায় আসিয়া দাঁড়া ভাই, সর্ব্ব-বিধ অত্যাচার হইতে আমি তোদের রক্ষা করিব,—ওরে কে আছিস পদ-দলিত, ছুটিয়া আয় রে ভাই, আমি তোকে উষ্ণীষে ধারণ করিব।" জননীর জাতিকে যুক্তকরে ডাকিতে হইবে,— "স্তন্যদানকালে এই ক্ষীণপ্রাণ জাতিকে ভ্রাতৃপ্রীতির অমৃত পান করাইতে ভুলিস না মা, তোদের ভাব-সাধনার শক্তি ইহাদের মধ্যে সংক্রামিত করিয়া দিতে কার্পণ্য করিস্ না।"

আত্মপূজা।

আমরা শুধু তাঁহারই পানে চাহিয়া থাকি, কণ্ঠ যাঁহার মুক্ত,

কিন্তু নিজের কণ্ঠকে চিররুদ্ধই রাখি। আমরা শুধু অপেক্ষা করি, কবে কোন্ খদ্যোতিকা অথবা চন্দ্রমা আসিয়া এ অমাযামিনীর অন্ধতমসা বিদূরিয়া দিবে, কিন্তু সাধনার দিয়া-কাঠি দিয়া আত্ম-জীবনের ইন্ধনে অনল জ্বালিতে চাহি না। নিজের ক্ষমতা, নিজের শক্তি বিস্মরণের ওপারে রাখিয়া আমরা পরকে পূজিতে যাই, মায়া-মরীচিকালুব্ধ হইয়া পূজার পিপাসা তোযামোদে মিটাই। অথচ ভারত আজি যে অর্চ্চনা চায়, উহা পরের অর্চ্চনা নয়, নিজের অর্চ্চনা—আত্মপূজা। দেদীপ্যমান কর্ম্মগরিমার পঞ্চপ্রদীপ আর ঊর্দ্ধসঞ্চারী যশোধূপের সুরভি-ধূম্রে আত্মপূজার অপূর্ব্ব আরতি করিতে হইবে, নতুবা বিশ্ববাসীর দুঃখবিদূরী মহামহোৎসবে আমোদ জমিবে না।

কর্ম্ম-রহস্য।

দেশের সেবার নামে চেঁচামেচি সোরগোল নয়। দেশের সেবার অর্থ অকপট কাজ। অকপট ভাবে কাজ করিতে যাইয়া যদি কথা বলিতে হয়, বল, তাহাতে দোষ নাই। কিন্তু কথারই জন্য কথা বলিও না, কথাকে কাজের সহকারিণী করিও। হুজুগে 'নাম' কিনিতে পার, 'কাম' হয় না। অতএব শুধু হুজুগেই মাতিও না। যদি বোঝ যে কোনও হুজুগ তোমার কাজে আনুকূল্য আনিয়া দিতেছে, তবে নিঃসঙ্কোচেই তাহার যতটুকু সম্ভব সদ্ব্যবহার কর; কিন্তু বাক্যের বন্যায় ভাসিয়া চলিও না। ডুব দাও, কিন্তু ডুবিয়াই যাইও না।

দুঃখ।

বিশ্বমানবের দুঃখ যিনি ঘুচাইবেন, আপনার শত দুঃখকষ্টে তাঁহাকে অম্লান থাকিতে হইবে। পরের অশ্রু মুছাইতে চাহিলে নিজের অশ্রু রুদ্ধ রাখিতে হয়। পরের মুখে হাসি ফুটাইতে হইলে ব্যথার বিলাসে নিজেকে হাসিতে হয়।

দুঃখকে গ্রাহ্য করিয়াই আমরা বাড়াইয়া দেই। নতুবা, সাহসী পুরুষের পদতলে পড়িয়া দুঃখ কি মণিমাণিক্যের মত ঝক্‌মক্‌ করিয়া জ্বলিতে জানে না?

যখন আমরা পথ ভুলিতে চাই, দুঃখই তখন আঘাতের পর আঘাতে আমাদের সুপ্ত চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে এবং পথ চিনাইয়া দেয়।

যেখানে দেখিবে দুঃখ আছে, সেখানেই জানিও, এই দুঃখের অন্তরালে একটা গৌরবও প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

'সুখ' 'সুখ' করিয়া কাঁদিলেই কি সুখ আসিবে? দুঃখকে যতক্ষণ অঙ্গের ভূষণ করিতে না পারিয়াছ, ততদিন সুখ কোথায়? অন্ধকারেই আলো জ্বালাইতে হয়, দিবসে নয়।

প্রতিষ্ঠার প্রকৃত পথ।

তুমি শুধু নিজেকে চাহিয়াছিলে বলিয়াই অপরে তোমাকে চাহে নাই। তোমার স্বার্থ, তোমার ব্যক্তিগত ভেদবুদ্ধি তোমাকে বিশ্বের বক্ষস্পন্দনের অনেক দূরে রাখিয়াছে। যতক্ষণ আমি নিজেকে লইয়া ব্যস্ত থাকি, ততক্ষণ জগৎকে গ্রহণ করিতে চাহি না বা পারি না। কিন্তু যাই নিজেকে স্বার্থ

হইতে বঞ্চিত, লোভ হইতে রিক্ত, লালসা হইতে পৃথক্কৃত করিয়াছি, অমনি বিশ্বের ব্যথা-বেদনা হর্ষ-আনন্দ একযোগে আমাকে জড়াইয়া ধরে। যতক্ষণ প্রতিপত্তি চাই, ততক্ষণ উহা পাই না। কিন্তু উহাকে ছাড়িয়া গেলেই প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি দেবপূজার অঞ্জলির ফুলের মত স্তূপীকৃত হইয়া আসে।

পরিচয়-পত্র।

আপনারই হৃদয়-রাজ্যে সৎ ও মহৎ বলিয়া যে জন প্রচার পাইয়াছে, পার্থিব রাজার শাসিত রাজ্যে পরিচয়ের অপেক্ষা সে রাখে না।

ত্যাগ ও ভোগ।

যাহা আমার নাই, তাহাকে স্বশক্তিতে লাভ করিতে হইবে। যাহা-কিছু আমার আছে বা হইবে, তাহাকে পরার্থে ত্যাগ করিতে হইবে।

আদর্শের মহত্ত্ব।

নিজেকে বড় বলিয়া পরিচিত করিতে ব্যগ্র হইও না,—নিজের আদর্শকে বড় কর এবং সেই মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অকপটে আত্মোৎসর্গ কর। দেখিবে, অচিরেই মহত্ত্ব আসিয়া তোমার চরণ-ধূলিতে বাসা বাঁধিবে।

বাঁচিবার মত বাঁচ।

বাঁচিবার জন্যই বাঁচিয়া থাকিতে হইবে জীবনের প্রতি এত অনুচিত মমতা কেন? বাঁচিয়াই যদি থাকিতে হয়, মানুষের মত বাঁচ। পশুপক্ষীও ত' বাঁচিয়া থাকে। বৃক্ষলতাও ত' জীবন-ধারণ করে। বাতাহত লতিকার মত জীবন-ধারণ কি

গৌরবের ? মানুষ হইয়া জন্মিয়াছ, তুমি কি পশুর মত বাঁচিয়াই তৃপ্ত হইবে ? কর্ম্মের প্রয়াস-স্পন্দনে ব্রহ্মাণ্ড যদি কাঁপাইয়া দিতে না পার, সত্যের অশনি-সম্পাতে মিথ্যার সাড়ম্বর দর্পদম্ভ নিমেষে যদি বাতাসে মিশাইয়া দিতে না পার, প্রাণময় স্পর্দ্ধার জোয়ারে সকল দীনতা ও হীনতাকে যদি ডুবাইয়া দিতে না পার, তাহা হইলে তোমার জীবনের প্রদীপ জ্বলিলেই বা কি, নিবিলেই বা কি ?

ত্যাগী ও মৃত্যু।

জাগতিক ঐশ্বর্য্য ও মান-যশের কামনায় পদাঘাত করিয়া যিনি বিশ্বকল্যাণে আত্মবলি দিতে কৃতধী হইয়াছেন, মরণ তাঁহাকে ভীত করিতে পারে না ; জীবনের যবনিকা যে তাঁহাকে জগৎ-সেবার অধিকারে বঞ্চিত করিয়া দিল, ইহাই তাঁহার চিত্তে বাধা দেয়। দেহ-ধ্বংসে তাঁর আপত্তি নাই, দেহের সুখে তাঁর লোভ নাই, দেহের প্রতি তাঁর আসক্তি নাই। যে কোনও মুহূর্ত্তে যে-কোনও ভাবে মরিতে তিনি তিলমাত্রও অসম্মত নহেন, তথাপি তিনি যদি দীর্ঘ জীবন পাইতে চাহেন, তবে তাহার কারণ জগৎ-সেবার দীর্ঘতর সুযোগের প্রতি লোভ। হিসাব করিয়া দেখিতে গেলে, ইহাও দুর্ব্বলতা। কিন্তু নিষ্কলুষ কর্ম্মযোগীর এতটুকু দুর্ব্বলতা ক্ষমার একান্ত অযোগ্য নহে।

উপাসনা।

ভাইরে, চোখ বুজিয়া নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেই উপাসনা

হয় এমন নয়। প্রতি অঙ্গ যতদিন ভগবানেরই কাজের জন্য কাঁদিয়া না মরিবে, ততদিন তোমার উপাসনায় অধিকার কি? শিথিলতার মধ্যে উপাসনা নাই, আছে সজাগ কর্ম্মে। বিশ্বাস কর, তোমার কর্ম্মজীবনই ভগবচ্চরণে রক্তজবার পুঞ্জীকৃত অঞ্জলি। প্রত্যয় রাখ, তোমার প্রত্যেকটা উজ্জ্বল চিন্তা তাঁহার আরতির অমর আলোক। প্রতিবেশীর দুঃখ-মুক্তির জন্য যদি একটা কথাও বলিয়া থাক, তাহা হইলেই তোমার উপাসনা হইয়াছে। স্বদেশের অধঃপতন ভাবিয়া যদি বিরলে বসিয়া বিন্দুমাত্র অশ্রুমোচন করিয়া থাক, তোমার উপাসনা হইয়াছে। পর্ব্বত-প্রমাণ বাধাকে হেলায় লঙ্ঘন করিয়া যে উৎসাহী যুবক বড় হইতে চায়, তাহার পথের যদি কুটা-গাছটীকে সরাইয়া থাক, তোমার জীবন উপাসনার উষার অরুণ হইয়া গিয়াছে। পরকে ভালবাসিয়াছ কি? নিজের কথা ভুলিয়া যাইয়া মুখের গ্রাস ক্ষুধিতেরে তুলিয়া দিয়াছ কি? একটা ছাগশিশুকে বাঁচাইতে চাহিয়া আপনার শির যূপকাষ্ঠে পাতিয়াছ কি? যদি করিয়া থাক, উপাসনায় তোমার কিসের প্রয়োজন? স্থির রহ ভাই, যাঁহাকে জন্ম জন্ম তপস্যা করিয়াও পাওয়া যায় না, তোমাকে কোলে তুলিয়া লইবার জন্য তিনি যে নিজেই ছুটিয়া আসিতেছেন।

প্রস্তুত হও।

ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই ক্রন্দন করিয়া যে প্রাণবায়ুটুকু

নিঃশ্বাসের আকারে গ্রহণ করিয়াছিলাম, একদিন যখন উহা ফিরাইয়াই দিতে হইবে, তখন যেন হাসিমুখেই দিতে পারি, তাহারই জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে। যে প্রাণ পাইবার কালে কাঁদিয়াছিলাম, সেই প্রাণ যাইবার কালেও যেন অক্ষমের আকুল ক্রন্দনে আকাশ বাতাস মথিত করিয়া না যাই,—যে প্রাণ দিবার জন্য পাইয়াছিলাম তাহাকে দেশের, দশের এবং জগতের কল্যাণ-কাজে সমর্পণ করিতে যাইয়া যেন আবার মিথ্যা মমত্বে মোহমুগ্ধ হইয়া অবসাদ ও আত্ম-অবিশ্বাসে আচ্ছন্ন হইয়া না পড়ি, তাহারই জন্য প্রতি পলে অনুপলে আমাদিগকে শুধু সাহস ও পৌরুষ সঞ্চয় করিতে হইবে। ঐ যে আমার শ্বাস-প্রশ্বাস কখনও নীরবে কখনও হুহুঙ্কারে বহিতেছে, সে কি আজ আমাকে এই মহাবাণীই শুনাইতেছে না যে,—"প্রস্তুত হও ?" ঐ যে হৃৎপিণ্ডে কখনও অতি মৃদু, কখনও অতি চঞ্চল স্পন্দন বাজিতেছে, সেও কি আমাকে এই একই আদেশ করিতেছে না যে, "প্রস্তুত হও ?" তাহারা যেন বলিতেছে,—"হে মানব, প্রস্তুত হও, নির্ভীক মৃত্যু মরিয়া মহামানব হইবার জন্য প্রস্তুত হও, সার্থক মৃত্যু মরিয়া অমর জীবন পাইবার জন্য প্রস্তুত হও।"

কি চাই!

নহে—নিষ্ক্রিয় জীবন, চাহি—কর্ম্মের আহ্বান ;
নহে—অনিচ্ছু যতন, চাহি—শ্রমের তুফান।

নহে—সন্দিগ্ধ পরাণ, চাহি—অবাধা প্রেরণা ;
নহে—মধুচ্ছন্দী কথা, চাহি—যথার্থ বেদনা।
নহে—সত্যের বিলাস, চাহি—সত্যের সাধন ;
নহে—বিক্ষিপ্ত বিয়োগ,—চাহি—যোগযুক্ত মন।
নহে—মনীষীর মেধা, নহে—মনস্বীর মত ;
নহে—মৃত শাস্ত্রবাণী, চাহি—নিত্য সত্যপথ।

প্রধান শত্রু।

সর্ব্বজনীনভাবে অবৈধ বীর্য্যক্ষয় প্রতিরুদ্ধ হইলে, পুরুষানুক্রমিকভাবে সংযমের সাধনা প্রতিষ্ঠিত হইলে, দুঃখ বল, দারিদ্র্য বল, পরাধীনতা বল, সামর্থ্যহীনতা বল, উদ্যমরাহিত্য বল, আর ব্যাধিপ্রবণতা বল,—সবই কটাক্ষের ইঙ্গিতে দূরীভূত হইবে। বীর্য্যক্ষয়ই আজ আমাদের প্রধানতম শত্রু, আর ব্রহ্মচর্য্যই আমাদের উদ্ধারের বীজমন্ত্র। ম্যালেরিয়া নহে, প্লেগ নহে, একমাত্র অবৈধ বীর্য্যক্ষয়ই আমাদের প্রচণ্ডতম শত্রু।

বর্ত্তমানের ভবিষ্যৎ।

মানুষ বর্ত্তমানেই বাঁচিয়া থাকিতে চায়, কিন্তু বর্ত্তমানেরই জন্য নয়। দিন আসিবে, যখন তাহার সমগ্র জীবনের প্রাণপাত পরিশ্রমের সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে, কিন্তু আজই নয়। দিন আসিবে, যখন তাহার ক্ষীণতম চিন্তাটিও ভবিষ্যৎ যুগের সভ্যতার উপরে রেখাপাত না করিয়া ছাড়িবে না। দিন আসিবে, যখন তাহার ছোটবড় সবগুলি কথা ও কাজ কোলাহল করিতে

যথাযোগ্য স্থান দাবী করিবে। মানুষ ঠিক সেই দিনটিতে প্রাণান্ত করিয়াও প্রাণ পায়, শ্রান্ত হইয়াও সজীব হয়।

ভিক্ষা চাহিও না।

মানুষকে মানুষই থাকিতে হইবে, নিজেরই পায়ে দাঁড়াইতে হইবে, অপরের কৃপা-ভিক্ষা করিলে চলিবে না। জীবনে ভুলিও না,—ভিক্ষায় আত্মার শক্তি কমিয়া যায়, কর্ম্মাকাঙ্ক্ষা দীনতায় নুইয়া পড়ে। মনে রাখিও,—ভিক্ষা করিয়া স্বর্গ মিলে না। স্বর্গ মিলে বীরত্বে। পরন্তু ভিক্ষায় মিলে পশুত্ব, ভিক্ষায় মিলে হীনতা, নীচতা আর অনপনেয় কলঙ্ক। প্রকৃতই যদি মানুষের মত বাঁচিতে চাও, জগন্মাতার শরণ লইয়া, বুক ফুলাইয়া দাঁড়াও। প্রতিজ্ঞা কর,—"বিশ্বকে আমি উপভোগ করিবই কিন্তু কাহারও অনুগ্রহে নয়, বাহুবলে।" তোমার ভগবান্ তোমাকে মানুষ করিয়াই গড়িয়াছেন, কোন্ প্রয়োজনে নিজেকে তুমি অমানুষ করিবে? বিশ্বটা তোমারই ; কার কাছে তবে ভিক্ষা চাহিতে যাইবে?

আত্ম-পরিচয়।

আমাদের অন্তর-পুরুষের যথার্থ পরিচয় আমরা এখনও পাই নাই। যদি পাইতাম, তবে ধনৈশ্বর্য্যে সুসমৃদ্ধ বাসনাসক্তের মুখে স্বদেশপ্রেম বা বিশ্বপ্রীতির কথা শুনিয়া আমরা উন্মার্গগামী হইতাম না। যদি জানিতাম, কোন্ দেবতা আমাদের অন্তরে বাহিরে প্রতি পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া নিজেকে অভিব্যক্ত করিয়া

তুলিতেছেন, তবে বাহিরের বিলাস-লীলায় রাজবেশে আমরা ভিখারী সাজিতে চাহিতাম না। যদি নিজেকে চিনিতাম, তবে পরকে কোলেও তুলিতে পারিতাম, চরণেও দলিতে পারিতাম ; কিন্তু বিচার না করিয়া মোহমুগ্ধের মত কাহারও কথায় উঠিতাম না, বসিতামও না।

ভণ্ডামি।

বাঁচিতেই যদি চাও ভাই, মরণকে অত ভয় করিলে চলিবে না। অসহায়া নারীর মরণাধিক দুঃখ চখের উপর দেখিয়াও জীবনটাকে রক্ষা করিতেই হইবে, একটা নশ্বর জীবনের উপরে এত অনুচিত মমতা কেন ভাই? নিজের অপমান অপমান নহে, তাই উহা সহিয়া যাইতে পারি, কিন্তু যেখানে প্রাণেরও যাহারা প্রিয়তম, জীবনেরও যাহারা জীবন, তাহারা লাঞ্ছিত, অবমানিত হইতেছে ; আমারই মাতা, আমারই কন্যা, আমারই ভগ্নী সর্ব্বস্ব হারাইতেছে, সেইখানেও যদি 'ক্ষমা মহত্তের লক্ষণ' বলিয়া চুপ মারিয়া থাকি, তবে আর ইহার অপেক্ষা বড় অধঃপতন কি আছে? যে নারীকে মহাশক্তি বলিয়া দাপটের চোটে বক্তৃতা-মঞ্চ ফাটাইয়া দেই, তাহার উপরে দুর্ব্বৃত্তের অত্যাচার দেখিয়াও সমাজের বা শাসনের ভয়ে উদাসীন থাকার চাইতে বড় ভণ্ডামি আর কি হইতে পারে?

মানুষের যথার্থ স্বরূপ।

যত তিমিরাচ্ছন্নই হউক না কেন, মানুষ আলোকেরই পুত্র ; যতই অবসন্নই হউক না কেন, সবলতারই সে উত্তরাধিকারী।

আকাঙ্ক্ষার আরতি।

নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভের জন্য কৃচ্ছ্র-সাধনের প্রয়োজন নাই। পার যদি, আকাঙ্ক্ষার আরতি দিতে সর্ব্বস্ব সমর্পণ কর। দাউ দাউ করিয়া জঠর-অনল জ্বলিয়া উঠুক, সমগ্র বিশ্বটাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবার আগে যেন সে অনল নিভিয়া না যায়। দুমুঠা নীবার-কণায় তুষ্ট রহিও না; ক্ষীরের সাগর চাই, সরের পাহাড় চাই, বিগলিত নবনীর সরিৎ-প্রবাহ চাই।

ঐহিক অমরতা।

আমাদের জীবন ইতিহাসের জীবন হউক, আমাদের ইতিহাস জীবনেরই ইতিহাস হউক।

ভারতের জাতীয় শত্রু।

ভুলিয়া যাইও না যে, আলস্যই ভারতের জাতীয় শত্রু। উদ্যম-রাহিত্যই ভারতের উন্নতি-কল্প-লতিকার সমূলোচ্ছেদক নির্ম্মম কুঠার!

জীবনের মূল্য।

আদর্শের চরণে যদি উৎসর্গীকৃত না হইল, তবে সে জীবনের মূল্য কি? যাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহাকে লাভ করিতে যাইয়া স্বার্থের মুখ চাহিব না, তবে ত' আমরা মানুষ।

কাপুরুষ নহি।

যাহা কিছু সহজলভ্য, তাহাকে লইয়াই যদি তুষ্ট রহিলাম, তবে ত' আমি ঘোরতর কাপুরুষ। দুঃখ আছে বলিয়াই আমি

সত্যকে চাই। লাঞ্ছনা আছে বলিয়াই আমি সিদ্ধিকে চাই। হলাহল উৎপন্ন হইবে জানিয়াও আমি সমুদ্র-মন্থনে ব্রতী হইয়াছি ; কারণ, আমি জানি, চির-আকাঙ্ক্ষিত অমৃত অনেক সাধনায়—অনেক বেদনায় মিলে।

দুঃখ নাই।

পুরুষের আবার দুঃখ কি রে? ব্যথা পাইয়া মানুষের সন্তান কাঁদিবে কেন? মলয়-বায়ুতে বেতস পত্রের মত যাঁহারা কাঁপে, তাঁহারাই অতীতের ব্যথার কথা বিনাইয়া বিনাইয়া ব্যাখ্যা করিতে করিতে বসিয়া কাঁদুক, তোমাদের কাঁদিলেও চলিবে না, কাঁপিলেও চলিবে না। দুঃখ যদি অঙ্গে ঠেকিয়া দশহাত ব্যবধানে ঠিকরিয়া না পড়িল, তবে তোমার সাধ-আকাঙ্ক্ষার মূল্য কি, চেষ্টা-উদ্যমের সার্থকতা কি? হিষ্টিরিয়ার মত মৃত্যু একটা মানসিক ব্যাধি, দুঃখ তাহার কল্পিত ছায়া। একটা ছায়া দেখিয়া চমকিয়া উঠিবে, ভীত হইয়া পিছাইয়া যাইবে, এত কাপুরুষ তুমি! হুঙ্কার শুনিয়া তুমিও কি হুঙ্কার করিয়া উঠিতে পার না? বিভীষিকাকে তুমিও কি ভয় দেখাইতে জান না?

দুঃখ নাই। আমার জন্য নাই, তোমার জন্য নাই, যাঁহারা দেশের বিন্দুমাত্র কাজ করিতে চাহেন, তাঁহাদের কাহারও জন্য নাই। কর্পূরের মত উহা চিরতরে উবিয়া গিয়াছে। সমুদ্র-শোষিত বাষ্পরাশি বৃষ্টির আকারে আবার ফিরিয়া আসে, কিন্তু

দুঃখ আর আসিবে না। মৃত্যু আমাদের নাই, ক্রন্দন আমাদের নাই, দুঃখ-বেদনা বিষাদ-যাতনা কিছুই আমাদের নাই; আমাদের যাহা আছে, তাহা স্বদেশের ও স্বজাতির কল্যাণকল্পে যুগে যুগে প্রাণপাত পরিশ্রম ও অসামান্য আত্মত্যাগ।

মানুষ যখন দুঃখের মোহপাশ ছিঁড়িয়া ফেলে, দুঃখ তখন আসে দেবতার মত জ্যোতির্ম্ময় হইয়া, করযুগে বরণ-ডালা লইয়া। মানুষ যখন দুঃখের শিরে শত পদাঘাত করিয়া স্ফীত-বক্ষে দাঁড়ায়, দুঃখ তখন আসে সেই পদাঘাত খাইয়াই ধন্য হইয়া যাইতে। প্রকৃতই যখন 'মানুষের' পদাঘাত তাহার মাথার উপরে গুরুভারে আসিয়া পড়ে, তখন সে বসন্তের সুরভি পুষ্পের মত অঙ্গনে অঙ্গনে ফুটিয়া উঠে, পূর্ণিমা-যামিনীর চন্দ্রমার মত নয়নে নয়নে হাসিতে থাকে। সে কি তখন আর দুঃখ থাকে রে? সে যে তখন পরশ-মাণিক! যাহাকে পরশ দিয়া যায়, তাহাকে হরষও দিয়া যায়; যাহার উপরে বুকের নিঃশ্বাস ফেলিয়া যায়, তাহার জন্ম-জন্মান্তরের পিপাসা মিটাইয়া দেয়।

দুঃখকে আমরা ভয় করিব না, গ্রাহ্য করিব না, পদাঘাত করিয়াই যাইব। নহিলে দেশের দুঃখ ঘুচিবে না, কোটি কণ্ঠের করুণ ক্রন্দন থামিবে না, অমৃতের দেশ হইতে মৃত্যু-যাতনা নির্ম্মূল হইবে না।

বিপদের প্রয়োজন আছে।

বিপদই মানুষকে বড় করিয়া তোলে! তাহার সমগ্র

জীবনের শিক্ষা, দীক্ষা ও সাধনার এমন উপযুক্ত পরীক্ষক আর নাই। নিকষ-পাষাণে কষিয়া বিপদই তোমার যোগ্যতার বিচার করিয়া লয়, বিপদই মুক্তকণ্ঠে তোমার উত্তরণ-কাহিনী ঘোষণা করিয়া দেয়। একটা একটা করিয়া বিপদের পাথর দিয়া যে বিরাট, বিস্তৃত মন্দির নির্ম্মিত হয়, তাহারই মধ্যে কীর্ত্তি-দেবতার প্রতিষ্ঠা।

অব্যর্থ জীবন।

আমাদের যে জীবন, উহা ত' ব্যর্থ হইবার জন্য নয়! আমাদের প্রাণের প্রত্যেকটা স্পন্দন বৈদ্যুতিক শক্তির মত লক্ষ হৃদয়ে কার্য্য করিবে; এজন্যই ত' আমাদের সৃষ্টি! লোকে আমাদিগকে অবজ্ঞা করুক, উপেক্ষা করুক, সে অবজ্ঞা, উপেক্ষা তাহারই আপন অঙ্গে গড়াইয়া পড়িবে। পরন্তু আমাদের জীবনের সার্থকতা অব্যর্থ-ই রহিয়া যাইবে।

ছোট ও বড়

আমরা যখন বড় হইব, তখন যেন ছোট-বড়'র পার্থক্যটাকে আরও বড় করিয়া না নেই।

দুর্গতির নিদান।

মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্বের যে প্রীতি-পবিত্র মধুর সম্বন্ধ, তাহারই স্বীকার ও মর্য্যাদা-দানে আমাদের দুর্দ্দৈব ঘুচিবে। আমাদের যে দুঃখ, তাহা কেবল বিক্ষিপ্ততার দুঃখ, নির্ব্বান্ধবতার দুঃখ, ভাইকে ভাই বলিয়া না চিনিবার দুঃখ। এই যে আঁধার কোণে বসিয়া মনের ক্ষোভে কাঁদিয়া মরি, সে ত' তোমাতে

আমাতে চেনা জানা নাই বলিয়াই! মানুষ যদি মানুষকে চিনিত, যদি তাহার নিজের হৃদয় দান করিয়া পরের হৃদয় আপন করিতে পারিত,—ধরণী স্বর্গ হইত।

দল না বল?

মনুষ্যত্বই মানুষের শ্রেষ্ঠ গৌরব। সঙ্ঘ বল, দল বল আর সম্প্রদায় বল, সবই এই মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য পরিকল্পিত। যখন দল গড়িলে মনুষ্যত্ব খর্ব্ব হয়, তখন দল পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। আর যখন দল না গড়িলে মনুষ্যত্ব-বিকাশের বাধা হয়, তখন দল গঠনই শ্রেয়ঃ। বলবৃদ্ধিই প্রধান কথা। দল-গঠনে যদি বল বাড়ে, তবে দল প্রশস্ত। দল গঠনে যদি বলের হ্রাস হয়, তবে দল অগ্রাহ্য। তোমাকে আগে মানুষ হইয়া লইতে হইবে, আত্মগঠনের চেষ্টাকে অপর সর্ব্ববিধ চেষ্টার পুরোভাগে স্থান দিতে হইবে এবং যাহা তোমার আত্মগঠনের অনুকুল, তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া, যাহা কিছু প্রতিকুল, তাহাকে নির্ম্মমভাবে বর্জ্জন করিতে হইবে।

ব্যষ্টি ও সমষ্টি।

প্রত্যেকটি মানুষ যেখানে ছোট হইয়া রহিয়াছে, দেশ বা সমাজ সেখানে বড় হইবে কোন্ যোগ্যতায়? প্রত্যেকটী মানুষ যেখানে মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষে পরিণত হইয়াছে, দেশ বা সমাজ সেখানে পৌরুষের প্রমাণ যোগাইবে কোন্ যাদুমন্ত্রে? প্রত্যেকটী মানুষ যেখানে দাসভাবের বন্যায় ভাসিয়া যাইতেছে, দেশ বা

সমাজ যেখানে আত্মপ্রতিষ্ঠার অভ্রচুম্বী সৌধ গড়িবে কোন্ ইন্দ্রজাল-বিদ্যায় ? প্রকৃতই যদি ভারত-সমাজকে বিশ্বসমাজের নেতৃত্বের সিংহাসনে সমাসীন করিবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের জাগিয়া থাকে, প্রকৃতই যদি ভারতের নিজস্ব বিশিষ্টতার প্লাবনে সমগ্র জগৎকে ভাসাইয়া দিবার সাধ আমাদের হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেকটী গণ্য নগণ্য মানবের মধ্যে মনুষ্যত্ব লাভের স্পৃহা ও যোগ্যতাকে উন্মেষিত করিয়া তুলিতে হইবে। ছোট-বড়'র বিচার ভুলিয়া, জাতি-বর্ণের গণ্ডী কাটিয়া, স্ত্রী-শূদ্রের অনধিকার অস্বীকার করিয়া, প্রত্যেককে ব্রহ্মশক্তি আহরণের পন্থা প্রদর্শন করিতে হইবে। ব্যষ্টিভাবে এখনও আমাদের মধ্যে বড় হইবার যথেষ্ট উপাদান ও সম্ভাবনা সঞ্চিত রহিয়াছে, হৃদয়ের উদারতার দ্বারা সেই ব্যক্তিগত সম্পদকে সমস্ত জাতির মধ্যে ছড়াইয়া দিতে হইবে,—তবেই আমরা সমষ্টিগতভাবে মানুষ হইব, জাতি হিসাবে বড় হইব। উৎসর্গের মধ্য দিয়াই ব্যক্তির জীবন সমষ্টির প্রতি ধাবিত হয়, আবার স্বার্থপরতার মধ্য দিয়াই সঙ্কীর্ণতার বৃত্ত রচনা করে। যেদিন ব্যষ্টি আর ব্যষ্টি থাকিতে চাহিবে না, উৎসর্গের চিরবন্ধুর দুর্গম পথ বাহিয়া সমষ্টির অভিসারে ছুটিবে, যে দিন ধন-সঞ্চয় করিয়া তুমি একাকী এই ধনৈশ্বর্য্যে তৃপ্ত হইতে পারিবে না, সকলকে ঐশ্বর্য্যশালী করিবার উন্মাদনায় মাতিয়া উঠিবে, যেদিন জ্ঞান-সঞ্চয় করিয়াও তুমি একাকী জ্ঞানী থাকিয়াই তুষ্ট রহিতে পারিবে না, প্রত্যেক

মানবের অজ্ঞানতাচ্ছন্ন অন্ধকার হৃদিকন্দরে জ্ঞানের বর্ত্তিকা লইয়া অগ্রসর হইবে, পরমপ্রেমময়ের নিত্যমধুর পেলব স্পর্শ লাভ করিয়াও সুস্থির হইতে পারিবে না, প্রেম বিলাইবার জন্য দুয়ারে দুয়ারে ছুটিয়া যাইবে, সেই দিনই জানিও, ভারত বড় হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

জাতীয় শিক্ষা।

স্বার্থ যখন বড় হয়, তখন দেশ, জাতি, জগৎ বা মানুষের যথার্থ রূপটা ঐ স্বার্থের আড়ালে পড়িয়া অন্তর্হিত হইয়া যায়। এই স্বার্থ যখন আঘাতের পর আঘাতে চুরমার হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে, তখনই আমরা ঠিক্ ঠিক্ দেখিতে পাই, দেশ কি, জাতি কি, জগৎ কি বা মানুষ কি। তখনই আমরা বুঝিতে পারি, ইহাদের পূর্ণতা রক্ষাই আমাদের আত্মরক্ষা। এই জন্যই যে শিক্ষা আমাদের স্বার্থবুদ্ধিকে সঙ্কুচিত করে, নিজের দুঃখের অপেক্ষা পরের দুঃখকে বড় করিয়া দেখিতে শিখায়, আমি তাহাকেই বলি জাতীয় শিক্ষা। প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিকে খুব শক্ত ভাষায় গালি দিয়া ঠিক তাহারই অনুকরণে একটা নূতন শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্ত্তনের নামই জাতীয় শিক্ষা দান নহে। এমন কি, বর্ত্তমান শিক্ষার বিদ্রোহ করিয়া বা প্রাচীন শিক্ষার পুনঃ-সংস্কার করিয়া গোশালা সকল গরু-বাছুরে পূর্ণ করিতে পারিলেই তাহাকে জাতীয় শিক্ষা বলিয়া স্বীকার করিব না। বর্ত্তমান শিক্ষার মধ্য দিয়াই হউক বা প্রাচীন শিক্ষার মধ্য

দিয়াই হউক, অথবা নূতনতর শিক্ষার প্রচলন করিয়া তাহার মধ্য দিয়াই হউক, যেদিন আমরা জাতির শিক্ষাপ্রার্থী কুমার-শক্তিকে এবং কুমারী-শক্তিকে আত্মপ্রীতিতে অনাস্থা করিয়া পরার্থে স্বার্থত্যাগে প্রেরণা দিতে পারিব, আত্মমোক্ষ-প্রার্থনায় নহে—পরন্তু জগতের কল্যাণেরই জন্য যেদিন ইহারা সন্ন্যাসকে আলিঙ্গন করিতে চাহিবে, ভোগ-লিপ্সার পরিতৃপ্তির জন্য নহে—পরন্তু জাতীয় উত্থানেরই জন্য যেদিন ইহারা গার্হস্থ্যকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইবে, সেই দিনই ঠিক ঠিক জাতীয় শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে পারিলাম বলিলে সত্যের অমর্য্যাদা হইবে না। দেশের জন্য সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া যাঁহারা চির-দারিদ্র্য বরণ করিয়াছেন, তাঁহারাও যদি শিক্ষার্থীর মধ্যে কোনও অজ্ঞাত কারণ বশতঃ পরের প্রাপ্য পরকে দিবার রুচি ও প্রবৃত্তি জাগাইতে না পারেন, তবে বলিব, ইহা জাতীয় শিক্ষা নহে। জাতীয় শিক্ষার মূলকথা শিক্ষকের ধর্ম্ম, বর্ণ বা জাতীয়তা নহে, পরার্থপরতাই জাতীয় শিক্ষার মূলমন্ত্র।

প্রেম চাই।

নদীর এপারে গান ধরিলে, ওপার হইতে অনুধ্বনি আসিবেই। তোমার মন্দিরে যখন প্রেম-সঙ্গীত ধ্বনিয়া উঠিবে, তখন দেখিবে, বিশ্ব জুড়িয়া সে সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি হইয়াছে। তোমার কুঞ্জে যখন কুসুম ফুটিবে, বিশ্বের কুঞ্জ তখন অপুষ্পিত রহিবে না। আমরা প্রেম পাইনা, কেবল প্রেম দেইনা

বলিয়া। * * * আমাদের যদি প্রেমই থাকিত, ঘরে ঘরে দশটা করিয়া উনান জ্বলিত না, বিশটা করিয়া জাতি হইত না, ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব ভাতের হাঁড়িতে যাইয়া প্রবেশ করিত না। দু'-পাতা ইংরাজী পড়িয়া তুমি আমাকে ঘৃণা কর, গলায় কার্পাসের সূত্র জড়াইয়া আমি তোমাকে ঘৃণা করি, ইহা ত' প্রেমেরই অভাব। যদি অতটুকু প্রেমও তোমার আমার মধ্যে থাকিত, তোমার আমার সমবেত কর্ম্মশক্তি দেখিয়া জগৎ আজ বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া রহিত।

দেশ অখণ্ড।

ছোট-বড়, উচ্চ-নীচ সকলকে লইয়া দেশ। ইহাদের কাহাকেও বাদ দিয়া তুমি দেশকে তুলিতে পার না। ছোটকে বাদ দিলে বড় ছোট হইয়া যাইবে, বড়কে বাদ দিলে ছোট ছোটই রহিবে। দেশ উঠিবে না।

আমরা অমর।

যাহারা বলে আমরা মরণ-সলিলে ডুবিয়া গিয়াছি, তাহারা ঘোরতর মিথ্যাবাদী। শ্রীক্ষেত্রের সমুদ্র-সৈকতে যে প্রাণ-স্পন্দন এখনও অটুট রহিয়াছে, তাহাকে সম্প্রসারিত করিয়া দাও,— বর্ণবিদ্বেষ ভুলিয়া সমগ্র জাতি এক হইবে। মৃত্যুঞ্জয়ের সর্ব্বস্ব ত্যাগের পূত ভস্মরাশি ললাটে মাখিয়া প্রত্যেকে দধীচির মত অস্থিদান করিবে। * * * আমরা মরি নাই, মরিতে পারি না।

ভক্তির অধিকার।

প্রেমে গলিয়া জল হইয়া যাও। কিন্তু গলিবার আগে জমিয়া যাও—বরফ হও, কঠোর নিষ্পেষণের মধ্য দিয়া। স্বচ্ছ হও, বকযন্ত্রের মধ্যে বিন্দু বিন্দু করিয়া আত্মবিশ্লেষণ ঘটাইয়া। তারপরে স্বর্গের অমৃতের মত বিধাতার আশীর্ব্বাদরূপে বরষিয়া পড়িও ; কিন্তু অগ্রে নয়।

মা আমার।

তোমাতে আমাতে সম্পর্ক শুধু মায়ের স্নেহের স্নিগ্ধদৃষ্টির বন্ধনে। জগংটা যে আমার, প্রকৃতির হাসি-কান্না, রৌদ্র-বৃষ্টি, ঝড়-ঝঞ্ঝা যে আমার, সে শুধু "মা আমার' বলিয়া। সুখ, সৌভাগ্য, সমৃদ্ধি যেমন আমার, দুঃখ-দুর্দ্দশা, দুর্গতিও তেমন আমার, সেও শুধু 'মা আমার' বলিয়া ! 'মা আমার' বলিয়াই আমি হিমাচলমিত বাধার সমক্ষে নির্ভয়ে দাঁড়াইব, 'মা আমার' বলিয়াই আমি অবনত, অনাদৃত, অবজ্ঞাত অব্রাহ্মণকে অর্ঘ্য দিয়া মাথায় তুলিয়া লইব * * * এস শুধু একবার কণ্ঠ খুলিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিয়া ঘোষণা করি,—"আমার আঁধারে সকল সুখ-স্মৃতি যখন ঢাকিয়া যাইবে, তখনও মা আমার ; বিজলী যখন চঞ্চলে চমকিবে, করকা যখন গম্ভীরে গরজিবে, তখনও মা আমার ; ধরণী যখন আগুনে জ্বলিয়া যাইবে; তখনও মা আমার ; সাগর যখন বরফ হইয়া যাইবে, তখনও মা আমার।"

প্রাণের কামনা।

তোমার সুখের অমরা-কুঞ্জে
প্রাণের আমার কামনা নাই,
শত মাথা যেথা নত হ'য়ে থাকে
সুখমাঝে সেথা বেদনা পাই।

মেঘ-মল্লার মধুর আলাপ
হরষের বান ডাকে না প্রাণে,
উল্লাসে হৃদি উঠে না নাচিয়া
সুর-শিল্পীর উছল গানে ;
বেদনা সহিয়া মরিছে কাঁদিয়া
যবে শত কোটি আমারি ভাই।
উজল উষার অরুণ কিরণে
বিভল হইতে ডেকো না মোরে,
কত নরনারী মোহে অচেতন
অমা-যামিনীর তমসা-ঘোরে ;
সবার নয়নে আলো না জ্বালাতে
এদের কেমনে ছাড়িয়া যাই ?
আশার প্রাসাদ চাহি না গড়িতে,
চাহি না লভিতে অমর যশ,
ধনের লালসে পাসরি' লক্ষ্য
চাহি না বিশ্ব করিতে বশ,
দীনের সেবায় স'পিয়া জীবন
জনম মরণ ভুলিতে চাই।

দেশোদ্ধার।

নির্ভর করিও, জ্বলন্ত সাধনায়—জীবন্ত তপস্যায়, কথার উপরে নয়। বিশ্বাস করিও, প্রাণের প্রেরণায়—অন্তরের আহ্বানে, বাহিরের উচ্ছ্বসিত শত শত কলকোলাহলে নয়। দেশোদ্ধার অভিনয় নয়,—সজাগ, সতেজ, সজীব কর্ম্ম! আত্ম-প্রতিষ্ঠা কল্পনার লীলায়িত তরঙ্গরঙ্গ নয়,—বাস্তবতার সৌম্য-সুন্দর প্রশান্ত অধিষ্ঠান। অভীষ্ট-লাভ শুধু ইচ্ছায় হয় না,—হয় ইচ্ছার অদম্য শক্তিতে, সাধকের প্রাণ-বিদ্যুতের পুঞ্জীভূত প্রবল স্পন্দনে, সঙ্কল্পের দুর্ব্বার আকর্ষণে। যে সুখ-সৌভাগ্য দেশের দুর্ভাগ্য ঘুচাইতে সমর্থ হইল না, তাহাকে চিরতরে জাহ্নবী-জলে বিসর্জ্জন দাও। যে চক্ষু দেশের নয়নে গোপন অশ্রুরাশি দেখিয়া শোকাপ্লুত হইল না, স্বহস্তে তাহাকে উৎপাটিত কর। যে কর্ণ দেশবাসীর ক্ষীণতম দীর্ঘনিঃশ্বাসটুকু শুনিয়া অপরিসীম সহানুভূতিতে চঞ্চল হইল না, গলন্ত সীসকে তাহা চিররুদ্ধ কর। যে রসনা আত্মশ্লাঘা ও আত্মপ্রবঞ্চনা পরিহার করিয়া দেশানুরাগের পূর্ব্বরাগ গাহিতে, জাতীয় অভ্যুত্থানের সন্দীপনী গীতি অনন্ত ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিতে নিঃশঙ্ক হইল না, তাহাকে অসিধারে ছিন্ন করিয়া দগ্ধ মরুর প্রতপ্ত বালুকায় নিক্ষেপ কর। যে হৃদয় দেশের ব্যথায় ব্যথিত, দেশের আঘাতে আহত, দেশের দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া না পড়িল, শেলাঘাতে তাহাকে বিদীর্ণ কর। যে বাহু স্বজাতির দুর্দ্দৈব অপসারিত

করিতে, স্বদেশের কলঙ্ক-কালিমা স্বীয় বক্ষরক্তে প্রক্ষালিত করিতে সর্ব্বদা সমুদ্যত না রহিল, প্রচণ্ড বজ্রাঘাতে তাহাকে চূর্ণিত কর। যাহা দেশের কল্যাণকে জাগ্রত না করিবে, তাহাকে চাহিও না ; যাহা জাতির ভবিষ্যৎ-নির্ম্মাণ না করিবে, তাহাকে রাখিও না। প্রিয় যদি হয়, শ্লাঘ্য যদি হয়, শত জীবনের সাধ আকাঙ্ক্ষার নির্য্যাসও যদি হয়, তাহাকে পদাঘাতে উপেক্ষা করিয়া যাও। এমনই করিয়া ইচ্ছার শক্তিকে অলঙ্ঘনীয় করিতে হইবে; দেশকে সর্ব্বস্ব বলিয়া আলিঙ্গন করিতে হইবে, স্বজাতির উন্নতির আকাঙ্ক্ষাকে সর্ব্বাবলম্বন বলিয়া কণ্ঠলগ্ন কবচ করিতে হইবে,—নতুবা দেশোদ্ধার হইবে না, জীবন্মৃত্যুর এই ভয়াবহ গহন অতিক্রম করিয়া অমৃতত্বের চিরশ্যামায়মান দিব্য প্রান্তরে উপনীত হওয়া যাইবে না।

আমার দেশ।

ভারত যদি অধঃপতিত হয়, তথাপি সে আমার স্বদেশ। সকল ত্রুটী, সকল অপরাধ লইয়াও আমি আমার স্বদেশকে ভালবাসিব, আমার স্বজাতিকে প্রীতির আলিঙ্গনে জড়াইয়া ধরিব। স্বদেশেরই লক্ষ লাঞ্ছনা ললাটে মাখিয়া মরিতে চাই, বিদেশের অতুল গৌরবে স্পর্দ্ধা করিতে চাহি না। স্বদেশের দুর্গন্ধ মৃত্তিকা আমার তীর্থভূমি, স্বদেশের পঙ্কিল প্রবাহ আমার মন্দাকিনী, স্বদেশের বিধ্বস্ত পাতালপুরী আমার স্বর্গের নন্দন।

সবলতা ও দুর্ব্বলতা।

দৈহিক দৃঢ়তা বা ক্ষীণতা দেখিয়া সবলতা বা দুর্ব্বলতার পরিমাপ চলে না। মানুষ শক্তিমান্ বা অশক্ত দেহে নহে, মনে—হৃদয়ে। হৃদয়টাকে যে যত নির্ব্বিচারে আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণে বিলাইয়া দিয়াছে, সে তত বলবান্; আর অপ্রেমের দৃঢ় রজ্জুতে আপন বিরাট অস্তিত্বটাকে বাঁধিয়া যে যত সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, সে তত দুর্ব্বল। যখন দেখিব, দুর্ভাগ্য দুর্গত দেশের নিখিল দৈন্য নিরাকৃত করিতে প্রেমবশে তুমি সকল শেলাঘাতের জন্য তোমার দীর্ণ বক্ষ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছ, তখন তোমার অপরাজেয় সবলতার সম্মুখে শ্রদ্ধায়-সম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিব; আর যখন দেখিব, মিথ্যা সম্মান কুড়াইয়া লইয়া আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিয়া স্বার্থবশে তুমি দেশবুদ্ধিকে পদদলিত করিয়াছ, তখন তোমার অপরিসীম দুর্ব্বলতা তোমার জন্য সহস্র-কণ্ঠের ধিক্কার-ধ্বনি বহিয়া আনিবে। দেশকে ভালবাসিয়া তুমি ক্ষীণ-দেহেও বলিষ্ঠ,—দেশকে উপেক্ষা করিয়া তুমি অটুট দেহেও দুর্ব্বল। দেশসেবার ক্ষীণতম আকাঙ্ক্ষা পুষিয়া তুমি নিদ্রায়ও জাগ্রত, মরণেও জীবন্ত; আর আপনার স্বার্থে সদা-জাগ্রত থাকিয়াও তুমি সুষুপ্ত, আত্মোদর-পূরণে চির-জীবিত রহিয়াও তুমি বিগত-প্রাণ।

আত্মশ্লাঘা।

তুমি যে তোমার স্কন্ধের ধমনী কাটিয়া অনুরাগের রক্ত-

সিঞ্চনে জননীর পুণ্য অভিষেক করিয়াছ, তুমি যে তোমার হৃৎপিণ্ডটাকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দেশমাতৃকার চরণে শত-দলের অঞ্জলি দিয়াছ, একথা নিজ মুখে ব্যক্ত করিতে হইবে না—তোমার অপরাজেয় কর্ম্মই তাহার নীরব ভাষায় অনাহত নাদে ঘোষণা করিবে। উদ্যানের রূপসী রাণী আত্মশ্লাঘা করে না, আপনার অপূর্ব্ব সৌরভ দশ দিকে ছড়াইয়া দিয়া সহস্রের প্রাণ কাড়িয়া লয়। আকাশের তারকাপুঞ্জ গৃহে গৃহে নিজেদের গুণ-গাথা গাহিয়া গাহিয়া বেড়ায় না, স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণ বিতরণে উদাসীনের অলস নেত্র তড়িৎ-চাঞ্চল্যে টানিয়া আনে। যে মহীয়সী প্রেরণা পাইয়া উত্তাল সমুদ্র-তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়াছ, তাহা নিজেকে আত্ম-প্রশংসার অন্ধকূপে আবদ্ধ করিবার জন্য নয়। যে শক্তির স্ফুরণে প্রাণময় উচ্চাকাঙ্ক্ষার দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে, উহা তোমার ব্যক্তিত্বকে অগণিত অন্তরে সঞ্চারিত না করিয়া পূর্ণতা পাইবে না, একথা নিশ্চয় জানিও; কিন্তু সাবধান, ভ্রমেও যেন আত্মশ্লাঘার মসীপ্রলেপে আপনার গৌরবদীপ্ত ভাস্বর ললাটে অগৌরবের অন্ধকার অধিষ্ঠান রচিয়া দিও না। তোমার ত্যাগ, তোমার আহুতি যতই বিরাট হউক না, প্রতি মুহূর্ত্তেই এই গরিষ্ঠ সত্যে চির-জাগ্রত রহিও যে, স্বজাতির উদ্ধারের নিমিত্ত আপন জীবন বলি দিয়াই তৃপ্ত রহিলে চলিবে না,—তোমাদের সহস্র জীবন পাইতে হইবে, সহস্র জীবনই আদর্শের চরণে নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে

স্ব স্ব হস্তে উৎসর্গ করিতে হইবে। নতুবা কোটি কণ্ঠের করুণ আর্ত্তনাদ থামিবে না, কোটি হৃদয়ের অসহ মর্ম্মদাহ জুড়াইবে না, কোটি নয়নের বিগলিত অশ্রু-ধারা শুষ্ক হইবে না। বিশ্বাস করিও, দুর্ভাগ্যের এই দুর্জ্জয় রণোন্মাদ তোমারই আত্মত্যাগের নিশিত কৃপাণে অবসন্ন হইবে; কিন্তু স্মরণে রাখিও, আত্ম-বিশ্বাসে জীবন-ভিত্তি গড়িতে যাইয়া আত্মপ্রশংসার দুর্ব্বলতায় সে সৌধকে ভঙ্গুর করিলে চলিবে না।

আলস্য দোষের আকর।

জগতে সকল অপরাধের ক্ষমা আছে, সকল দোষের ক্ষালন আছে, সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে,—নাই কেবল আলস্যের। অনলস কর্ম্মী পুরুষ সহস্র হস্তে কর্ম্ম করিয়া লক্ষ প্রতিকূলতার মধ্যেও আপন প্রতিষ্ঠা গড়িয়া লয়, আর অলসের সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা আপনা আপনি ধ্বসিয়া পড়ে! অলস রাজার রাজ্য বাতাসে উড়িয়া যায়,—অলসের সুস্থ দেহ বিনা রোগে ক্ষয় পায়,—অলসের ধন ইঁদুরের গর্ত্ত দিয়া পরের ঘরে চলিয়া যায়। মহাপাপীও অক্লান্ত কর্ম্মশীলতার প্রভাবে জীবনকে দুঃখ-মুক্ত করে,—অলসের সমৃদ্ধ জীবন দুর্ভাগ্যের প্লাবনে ডুবিয়া যায়। কর্ম্মী তাহার অন্নরাশি বিধাতার ভাণ্ডার হইতে নিজ বাহুবলে কাড়িয়া আনে, আর অলসের ঘৃতান্ন উদরে অম্লের সৃষ্টি করিয়া মৃত্যুর পথে টানিয়া নেয়। অলসের চিন্তা কুকথায় পুষ্ট হইয়া জীবনকে ভারাক্রান্ত ও অন্ধকার করিয়া তোলে,

আর কর্ম্মীর অনলস চিন্তাস্রোত জগতের প্রাণ-প্রবাহে বল-সঞ্চার করে।

শ্রেষ্ঠ সত্য।

তুমি যে চিরনবীন, চিরপ্রবহমান ও চিরবিচিত্র, সে শুধু কত বিপদের কত ধরণের সংগ্রাম-লীলার মধ্য দিয়া তুমি নিজের উচ্ছ্বাসকে ক্রমেই ফুটাইয়া তুলিতেছ বলিয়া। তুমি যে সদাসুন্দর, চিরকমনীয়, উহা শুধু দুঃখের সহিত মল্লযুদ্ধে বিষম ছুটাছুটি লুটাপুটির মধ্যে তোমার যাহা কিছু অসুন্দর, যাহা কিছু কুৎসিত, তাহাই পথের ধূলিতে গড়াইয়া পড়িতেছে বলিয়া। * * * বিধাতার শুভেচ্ছা যে বিপদের পর বিপদ দিয়াই আমাদিগকে পরিণত ও পূর্ণ করিয়া তোলে, এইটাই সবচেয়ে বড় আশ্বাসের কথা। পিঠের উপরে বোঝা চাপে, বুকের উপরে আঘাত লাগে, শুধু যে ভগবানের আদেশ মানিয়া, এইটুকু সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সত্য। আবার, বোঝার ভারে বাঁকিয়া না যাওয়া, এ ব্যথার ভয়ে পিছাইয়া না পড়া যে বিধাতারই অভিপ্রেত, ইহাও পরম সত্য।

ছোট নহ।

তুমি যে ছোট, তুমি যে দীন, একথা বজ্রকণ্ঠে অস্বীকার কর। ধরা কম্পিত করিয়া বল,—তুমি ছোট নও, তুমি হেয় নও, তুমি অনুকম্পার পাত্র নও। তোমার জীবন অক্ষত—অটুট, তোমার আদর্শ অনবদ্য—সুন্দর ,তোমার ভগবান্

অদ্বিতীয়। শতবার বল,—তোমার নিঃশ্বাসে ঝঞ্ঝা বহে, তোমার ইঙ্গিতে প্রলয় হয়। আরও বল,—তোমারই মুখের প্রসন্ন হাসিতে পুষ্পে পুষ্পে চিরবসন্ত বিরাজ করে, তোমারই চ'খের রুদ্র দৃষ্টিতে বিশ্বসংসার জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়।

বড় হবি ত' বড়ই হ।

'অতি বাড় বেঁড়ো না, ঝড়ে প'ড়ে যাবে'—একথা কাপুরুষের। কেন বাছা, ঝড়ে পড়া গাছের মত বড় হইবার চেষ্টাটা একবার করিয়াই দেখ না। সকলের সঙ্কীর্ণ বড়'র দিকেই উঁচু হইয়া থাকে বলিয়া বড় হইবে না? বনে জঙ্গলে আশ্রয় খুঁজিয়াও রাণা প্রতাপ চির-নমস্য। সেন্ট হেলেনায় জীবন কাটাইয়াও ফরাসী বীর মাথার উপরে। ঘটোৎকচ মরিতে মরিতেও অসংখ্য শত্রুর প্রাণহন্তা। হাতীই হও, যেন মরিলেও লক্ষ টাকা থাকিয়া যায়। পিঁপড়ার জীবন পাইয়া লাভ কি? আগাছার সংখ্যা-বৃদ্ধিতে আশ্বাসের কি আছে? বড় হইতেই হইবে। তাহার জন্য যে মূল্যই দিতে হউক না।

কর্ম্মের পথে।

যদি কর্ম্মের পথে চলিতে চাও, বিশ্বাস কর, এ পথ তোমারই। বিশ্বাস কর, তোমারই স্বদেশানুরাগের পরীক্ষা করিয়া লইবার জন্য বিপদের কোটি কন্টক পথের উপরে পড়িয়া আছে। বিশ্বাস কর, ইহাদের একটি খোঁচাও ব্যর্থ নয়, ইহাদের একটি ব্যথাও তোমাদের মনুষ্যত্বকে সমৃদ্ধ না করিয়া যাইবে না।

তোমারই অন্তরতম মহত্ত্বকে ইহারা জাগ্রত করিতে চায়, তোমারই চরণতলের শোণিত-সিঞ্চনে ধরিত্রীকে পুণ্যাপ্লুত তীর্থভূমি করিতে চায়।

কেমন জীবন চাই।

তেমন জীবন চাই, যাহা মরণে অভিভূত হয় না ; তেমন জীবন চাই, যাহা স্মরণে বিস্মৃত হয় না। তেমন জীবন চাই, যাহা পার্থক্য ঘুচাইয়া দিবে। জীবনকে করিবে রৌদ্রদীপ্ত কর্ম্মময়, মরণকে করিবে শান্তি-স্নিগ্ধ সিদ্ধিময়। জীবনকেও চাই, মরণকেও চাই, নিজের জন্য চাই, দেশের জন্য চাই, বিশ্বের জন্য চাই।

উন্নতির উপায়।

পরকে হিংসা করিয়া নিজের উন্নতি হইবে না, আত্মোন্নতির জন্য নিজেকে ভালবাসিতে হইবে। পরের ভালমন্দ ন্যায়ান্যায় সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষা করিয়া নিজের ভালমন্দ ন্যায়ান্যায়ের বিচার করিতে হইবে। আত্মপ্রতিষ্ঠাকেই একমাত্র লক্ষ্য কর, পরচর্চ্চা পরিহার কর। নিজেরই প্রতি অগাধ প্রীতি লইয়া আপন ভবিষ্যৎ বিশ্বামিত্রেরই মত কঠোর তপস্যায় ব্রাহ্মণ্যে মণ্ডিত কর। নিজেকেই নিঃশেষে স্নেহ করিয়া বিশ্বের সকল কোহিনুর নিজের বিলাসে উপহার দাও। ফিরিয়া চাহিও না অপরে কি বলে ; চাহিয়া দেখিও না, অপরে কি করে। আত্মোন্নতির সাধনের জন্য যাহাকে শ্রেষ্ঠ পন্থা বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছ, কর্ম্মজীবনের প্রতি পদবিক্ষেপে তাহাকেই অবলম্বন কর।

মুক্তির অর্থ।

পরের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার সামর্থ্য জন্মিলেই মুক্তি হইল না,—নিজের শত প্রকারের নীচতা, সহস্র প্রকারের দুর্ব্বলতা, লক্ষ প্রকারের উচ্ছৃঙ্খলতার উপর যেদিন প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারিবে, সে দিনই মুক্তি আসিবে। * * * দুঃস্থ, দুর্গত প্রতিবেশীর মস্তকে নিষ্ঠুর পদাঘাত করিয়া অহঙ্কার করিও না। জননীর জাতিকে শত লাঞ্ছনায় নিপীড়িত করিয়া মুক্তির দম্ভ রাখিও না। * * * যদি মুক্ত হইতে চাও, পতিতকে টানিয়া তোল, ঘুমন্তকে জাগাইয়া দাও, অলসকে কর্ম্ম-মন্ত্রে দীক্ষিত কর। নিজের প্রাণের মুক্ত বাঁশীর রব নির্ব্বিচারে, নিঃসঙ্কোচে প্রাণে প্রাণে ঢালিয়া দাও। কাহাকেও বাদ না দিয়া, কাহাকেও বঞ্চিত না করিয়া, যেদিন মুক্তি আসিবে, সেদিনই মুক্তি তাহার স্বরূপে আসিবে।

শ্রেয়কেই চাই।

ক্ষণিক দাহনে যদি চিরশান্তি পাই, অনলে পুড়িয়া অঙ্গার হইতে ভয় কি? ক্ষণিকের ব্যথা-বেদনায় যদি চির-চেতনা জাগিয়া ওঠে, অটল রহিব না কেন? ক্ষণিকের মৃত্যুতে যদি অনন্ত অমৃতত্ব মিলে, কেন মরিব না? ইষ্টকে যদি মিলে, কষ্ট সহিতে রুষ্ট হইব কি জন্য?

জীবনের পথ।

মরিতেই যখন বসিয়াছি, তখন আর বিচার-বিতর্কের বৃথা তত্ত্ব রচিয়া তাহাতেই জড়াইয়া পড়িতে চাহি না। বর্ত্তমানের

বিপুল দুঃখদাহন অতীত কর্ম্মের অনপনেয় ফলস্বরূপেই প্রসূত সত্য, কিন্তু তথাপি আজ অনুতাপের বা অনুশোচনার অবসর নাই ; কৃতকর্ম্মের জন্য তপ্ত অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া বৃথা সময়-ক্ষেপ করিতে আর পারি না। যেরূপেই হউক, তৃণখণ্ড ধরিয়াও যদি অধঃপতনের প্লাবন-পীড়ন হইতে রক্ষা পাইতে পারি, কোন ক্রমে যদি মৃত্যুর করাল গ্রাস হইতে দূরে সরিয়া রহিতে পারি, আজ আমাদিগকে তাহারই জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া দেখিতে হইবে। উন্নতি-মাত্রেই যখন পতনধর্ম্মী, সংযোগ-মাত্রেই যখন বিয়োগ-গামী, জীবন-মাত্রেই যখন মরণমুখী, তখন আমাদের এই দুঃসহ দুঃখ দুর্দ্দশা প্রকৃতিবশেই আসিয়াছে ; আবার—রজনীর ঘোরান্ধকারের পর যেমন স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণচ্ছটার কনক-কিরীট পরিয়া দিন আসে, মেঘাপসরণের পর কৌমুদীস্নাতা বসুন্ধরা যেমন বিপুল হরষে হাসে, শীত-প্রকোপে পত্রপুষ্পহীন হইয়াও নব-বসন্তে যেমন পাদপপুঞ্জ কোকিল-কূজনে ভ্রমর-গুঞ্জনে সকল বিষাদ-বেদনা ভুলিয়া যায়, আমাদেরও তেমনই দুঃখনিশার অবসান হইবে—আমাদেরও আননে হাসি ফুটিবে—আমাদেরও জীবন-কাননে ভৃঙ্গ-কোকিল নব-বসন্তের জীবনীয় অমৃতধারা মলয়-হিল্লোলের তরঙ্গিত অঙ্গে অকৃপণ কণ্ঠে ঢালিয়া দিবে। আজ এই হতাশার দিনে, অবসাদের এই দুঃস্থ মুহূর্ত্তে কল্পনার কুহক-স্নেহে শুধু আশারই প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিতে হইবে। যদি বাঁচিতে

চাও, এই আশার বাণী ভুলিও না। আশায় প্রাণ বাঁচিয়া থাকে, শত দুঃখের রুদ্র-দলনে মানুষ আশাতেই বুক বাঁধিয়া রাখে। তোমার সুখরবি ডুবিয়া গিয়াছে। কিন্তু আবার গগন-ভালে প্রোজ্জ্বল জ্যোতিতে উদিবে—শুধু আশা রাখ। তোমার জীবন-প্রবাহিনী শুকাইয়া গিয়াছে, কিন্তু আবার কল্লোলমালিনী দুকুল প্লাবিয়া বহিবে,—শুধু আশা রাখ। যদি বাস্তবে নিরাশ হইয়া থাক, শুধু কল্পনায় আশ্বাস লও,—ভয় নাই ভাই, এ দুঃখ ঘুচিবে, এ কলঙ্ক মুছিবে, আমরা মরিতে মরিতেও বাঁচিয়া উঠিব।—মনে রাখিও, ইহাই আমাদের জাতির উদ্ধারের একমাত্র পথ, নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়।

বাস্তুভিটার অধিকার।

যে মাটির পরশ পাইয়া জীবনের প্রথম নয়ন মেলিলাম, সে মাটির উপর অধিকার শুধু মুখের কথায় জন্মিতে পারে না। জানিতে হইবে, এই মাটি আমার মুক্তির প্রতীক-স্বরূপ, এই মাটি আমার জীবনের চিরারাধ্য দেবীপ্রতিমা, এই মাটি আমার শত কোটি জনমের পিপাসার পরিতৃপ্তি, আমার দাবদাহের স্নিগ্ধ চন্দন-প্রলেপ। বুঝিতে হইবে, এই মাটি আমার সকল সাধ-আকাঙ্ক্ষার নির্য্যাস, আমার সকল কর্ম্ম-সমৃদ্ধির ভাস্বর ভাল-তিলক। ইহাকে ভালবাসিতে হইবে—কবির নমনীয়, তরঙ্গায়িত, আবেগাকুল হৃদয় দিয়া, ইহাকে পূজা করিতে হইবে তত্ত্ববিজ্ঞের সুদূর-বিসর্পী, অতলস্পর্শী, অভ্রচুম্বী ভাবুকতা

দিয়া। তবেই ইহা আমার হইবে। যে অমল অতুল স্নেহ ইহার স্তনযুগ বাহিয়া ক্ষীর-নীর-ধারায় ক্ষরিয়া পড়িতেছে, তাহাতে পুষ্টি লভিয়া ইহারই চরণে জীবনে, মরণে, শয়নে, স্বপনে সমর্পিতাত্মবুদ্ধি ও নিবেদিতাত্মচিত্ত হইতে হইবে। তবেই ইহা আমার হইবে। যাহাকে কখনও ভালবাসি নাই, যাহার ভালবাসার মর্য্যাদা রাখিতে প্রাণ দিতে পারি নাই, সে কখনও 'আমার' হয় কি ?

স্বদেশ-পূজা।

শৈব যাঁহাকে শিবময় ভাবিয়া উপাসনার কুসুমাঞ্জলি ঢালিয়া দেয়, বৈষ্ণব যাঁহাকে বিষ্ণু ভাবিয়া তর্পণ-সলিল অর্পণ করে, শাক্ত যাঁহাকে শক্তি ভাবিয়া জীবন-সলিতায় সাধনাগ্নিতে আরতি জ্বালায়, তাঁহাতে ও আমার স্বদেশে আমি অভিন্নতাই দেখিতে চাহি। এদেশেরও প্রতি অণুপরমাণুতে বিশ্ববিধাতা আপন বিছাইয়া রাখিয়াছেন। উঁহাকেই যদি আমি ব্রহ্মময় ভাবিয়া প্রাণময় পূজায় নন্দিত করিবার যোগ্যতা অর্জ্জনে উন্মুখ হই, তাহাতে অপরাধ কেন হইবে ?

সাধুতা।

সর্ব্বদাই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া বুক বাঁধিয়া বসিবার নাম সাধুতা।

মরণ-ভয়।

মরিতে যাহারা ভয় পায়, মরণ তাহাদেরই আগে।

দুর্ভোগ, না দাসত্ব।

লোভের বশে ভোগ করার নাম ভোগ নয়, দুর্ভোগ; শাসনের ভয়ে ত্যাগ করার নাম ত্যাগ নয়, দাসত্ব।

অর্থ, না উৎসর্গ।

সমৃদ্ধি মানুষের চরণের রেণু, পথের ধূলি। মনুষ্যত্বের সাধনায় যিনি সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার নখর-কোণের পরশ পাইয়া সমৃদ্ধ হইতে উহা আপনি ছুটিয়া আসে। সর্ব্বত্যাগী মহেশের চরণসেবার দাসী কে জান? সর্ব্বসমৃদ্ধির আকর-স্বরূপা, সর্ব্বৈশ্বর্য্যের প্রসূতিভূতা পার্ব্বতী স্বয়ং। জীবনের সকল মাধুর্য্য তিনি ঐ নগ্নকায়, বিভূতিলিপ্তাঙ্গ, ভাবোন্মত্ত ক্ষিপ্তের পায়ে সঁপিয়া দিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন। গায়ে বিভূতি মাখিয়াছেন বলিয়াই মহেশ্বর বিভূতিমান্। গায়ে যখন ছাই দিয়া অঙ্গরাগ করিতে পারিবে, সর্ব্বস্ব স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিয়া যখন নির্দ্বন্দ্ব চিত্তে কৃত্তিবাস হইবে, তখনই আসিবে সমৃদ্ধি, তখনই আসিবে কীর্ত্তি। কৃত্তিবাস না হইলে, বাঘছাল না পরিলে, কীর্ত্তি আসে না—আসে শুধু ক্ষণভঙ্গুর চাটুবাক্যের অচিরস্থায়ী চঞ্চল উচ্ছ্বাস। যুগযুগান্তের সঞ্চিত কুবের ভাণ্ডার যাহারা নিমেষে ঢালিয়া অমর কীর্ত্তি গড়িতে চাহিয়াছে, তাহারা বিস্মৃতিতে বিলয় পাইয়াছে, দুদিনের খেলার সাথে সাথে তাহাদের দুদিনের অহমিকা চিরতরে ফুরাইয়া গিয়াছে। কীর্ত্তি কি আসে টাকায়? সে কি পয়সা দিয়াই কেনা যায়?

কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি—তাহারই জীবন অখণ্ড, যাহার কীর্ত্তি অখণ্ড ; তাহারই জীবন ভঙ্গুর, যাহার কীর্ত্তি ভঙ্গুর। সে মরিয়া আছে, যে কীর্ত্তিমান্ নহে। কিন্তু জীবন কি ঐশ্বর্য্যের লঘু-গুরুত্ব অপেক্ষা করিয়া যায় আসে ? বিথেলহামের অশ্বশালায় এক অনাথ বালক যে অমর জীবন পাইলেন, উহা কি ইহুদি পুরোহিত-কুলের তোষাখানার হিসাব রাখিয়া ? নদীয়ার কুটীর-প্রাঙ্গণে ঐ যে নিঃস্ব ব্রাহ্মণ-কুমার শ্রীহরিকীর্ত্তনে জীবন-সম্পদ খুঁজিয়া লইলেন, সে কি পাঠান বাদ্‌শার দুয়ারে যাইয়া ভিক্ষার ঝুলি হস্তে অনুগ্রহ যাচিয়া ? মানুষের জীবনই তাহার কীর্ত্তি ; নিজের কীর্ত্তি মানুষ নিজে। অতদিন ধরিয়া ত' দুর্গোৎসব করিয়া আসিতেছ, মহাপূজার মন্ত্র করিতেছ, একবারও তাহার মধ্যে যথার্থ বলি দিয়াছ ? পরের শিশু মায়ের বুক হইতে কাড়িয়া আনিয়া হত্যা করিয়াছ, কিন্তু নিজের জীবন, নিজের কীর্ত্তি বলি দিতে চাহিয়াছ কি ?—পারিয়াছ কি ? কি করিয়া নিজেকে নিঃশেষে উৎসর্গ করিয়া দিতে হয়, কাহারও কাছে তাহার মর্ম্মকথা জানিতেও চাহিয়াছ কি ? যে আয়োজন বর্ষ ব্যাপিয়া কর, সেই পূজোপলক্ষিতা জননীর প্রশংসমান দৃষ্টি প্রাণে কখনও কামনা করিয়াছ কি ? তুমি চাহিয়াছ আত্ম-প্রতারকের তোষভাষ, মিথ্যাশ্রয়ীর স্বার্থশ্লাঘা। হা দুর্ভাগ্য ! জগন্মাতার উপাসক তুমি অথচ সকল সাধনা হইতে তাঁহাকেই বাদ দিয়া দিয়াছ। তাঁহার একটু কৃপাকটাক্ষে যে বিশ্বজগৎ

নবীনতার বসন্তযৌবনে লাবণ্যময় হইয়া উঠে! নাম-যশের কাঙ্গাল তুমি, মান-সম্ভ্রমের ভিখারী তুমি, তাহা বুঝিলে না, বুঝিতে চাহিলে না। মাতৃপূজার পবিত্র মন্দিরে কি ঐ বারবনিতার কামকলুষ নৃত্যকলা! মানযশের কামনা, মানুষের মনের বারাঙ্গনা; তাহার স্পর্শ অপবিত্র, তাহার ছায়া অস্পৃশ্য। কামনা দূর কর, নিজেকে বলি দাও। জগজ্জননী পশুর রক্ত চাহেন না। চাহেন তোমার বুকের রক্ত। জগজ্জননী মূককণ্ঠের করুণ আর্ত্তনাদ শুনিতে চাহেন না, চাহেন—মুখর-কণ্ঠের মূক আত্মদান। তাই যদি দিতে পার, দাও, দাও, প্রাণ ভরিয়া দাও, সাধ মিটাইয়া দাও, আকাঙ্ক্ষা পুরাইয়া দাও, সকল ভবিষ্যতের সকল কল্পনা নিঃশেষ করিয়া দাও; বিন্দু বিন্দু করিয়া প্রতি বিন্দু রক্ত ঢাল, তিল তিল করিয়া জীবন সঁপিয়া দাও; একটু একটু করিয়া সকল বেদনা নিঃশব্দে সহ্য কর। উচ্চবাক্য করিও না; ঢাক-ঢোল বাজাইও না, কাসর-ঘন্টায় বায়ুমণ্ডল স্পন্দিত করিও না, সহস্র কণ্ঠে আর্ত্তধ্বনি তুলিও না, মায়ের পূজা নিঃশব্দে হইবে, নিভৃতে হইবে। মায়ের অর্চ্চনা শুধু তিনিই দেখিবেন, আর তুমিই দেখিবে, 'আর যেন কেউ না দেখে।' এমন করিয়া জীবন দাও! জীবন না দিলে ত' জীবন পাইবে না! যে মরে নাই, তার আবার কিসের জীবন? যে পড়ে নাই, তার আবার কিসের উত্থান? যে করে নাই, তার আবার কিসের কীর্ত্তি?

কীর্ত্তিমান্! সমগ্র কীর্ত্তি দাও। জীবন্ত! সমগ্র জীবন দাও। ইহকাল দাও, পরকাল দাও। তবে মনুষ্যত্বের সাধনা পূর্ণ হইবে, তবেই সমৃদ্ধি তোমার চরণ-সেবার ক্রীতদাসী হইবে।

প্রেমের জয়।

প্রেম যেখানে চিরপ্রদীপ্ত, গগনচুম্বী, অহমিকা সেখানে দৈন্যের চরণে লুণ্ঠিত হয়।

অশ্রুর সম্মান।

পরের দুঃখে অশ্রুপাত করিলেই চলিবে না, কর্ম্মের দ্বারা সেই অশ্রুর সম্মান অব্যাহত রাখিতে হইবে।

চিত্ত-তীর্থ।

তীর্থ দর্শনের জন্য আকণ্ঠ আকুলতার আবশ্যকতা কি? তীর্থযাত্রীর লক্ষীভূত সকল সুকৃতি গৃহে বসিয়াই অনায়াসে লাভ করিতে পার, শুধু যদি একটিবার অকপট হৃদয়ে প্রাণের কোলাহলময়ী সকল কামনাকে স্বদেশের কল্যাণের সহিত সংযুক্ত করিয়া দাও। তোমার আকাঙ্ক্ষা সহস্রশীল হইয়া অনন্ত ঊর্দ্ধে উত্থিত হউক, সহস্র চরণে সসাগরা ধরিত্রীর বিপুল বক্ষে আপন প্রতিষ্ঠা গড়িয়া লউক, সহস্র নেত্রে জগন্ময় স্বার্থান্বেষণ করুক, সহস্র বাহুতে ত্রিদিব-দুর্ল্লভ ভোজ্যপানীয় আহরণ করিয়াআত্মোদর পূর্ণ করুক। কিন্তু মনে অবিচল বিশ্বাস রাখিও, এ উত্থান তোমার নয়—সমগ্র দেশের, এ প্রতিষ্ঠা তোমার নয়—সমগ্র জাতির, এ স্বার্থ তোমার নয়—বুভুক্ষিত ত্রিশকোটি

ভ্রাতা ভগ্নীর। সহস্র রসনায় আস্বাদন কর, শতোদর হইয়া ভক্ষণ কর, কিন্তু শুধু মনে রাখ, তোমার ব্যক্তিগত তৃপ্তিতে সমগ্র দেশের তৃপ্তির পথ বাহির হইবে, তোমার পুষ্টিতে তিল তিল করিয়া সমগ্র জাতির অঙ্গে কান্তি-পুষ্টি সঞ্চিত হইবে। তাহা হইলে, তোমার চিত্তই তীর্থে পরিণত হইবে,—সে তীর্থতটের চরণ চুম্বন করিয়া মুক্তি-মন্দাকিনী অচিরে উজান বহিবে।

পতিতোদ্ধার।

জাতিকে তুলিতে হইলে আত্মাভিমানের স্পর্দ্ধিত সিংহাসন ছাড়িয়া নিম্নে আসিয়া জাতির সহিত মিলিতে হইবে। দুরন্ত দুঃখের দহনে যাহারা মরণোন্মুখ, কুসুম-পরিমল-বাহী স্নিগ্ধ সমীরণের জীবনীয় স্পর্শে যদি তাহাদের প্রাণশক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে চাও,—সকলের সাথে দহিয়া মরিতে দুঃখের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে হইবে। যাহারা মরিতে শিখিয়াছে, দেশের দুঃখ তাহারাই দূর করিয়াছে। প্রাণভয়ে ভীত, অভিমানে স্ফীত, আত্মস্বার্থপ্রীত জীবিতেরা নহে! সকল প্রতিষ্ঠায় বিসর্জ্জন দিয়া, সকল আশার প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, নিম্নতমের সমান হইয়া দাঁড়াও, দীনতমের পাশে দাঁড়াইয়া সকল লাঞ্ছনা সহিয়া যাও। নহিলে, পতিতকে উত্থিত করিতে পারিবে না, অবসন্নের শিরায় শিরায় তড়িৎ-প্রবাহ বহাইয়া দিতে সমর্থ হইবে না। কারণ, যেখানে সমতা নাই, সেখানে প্রেম নাই, যেখানে প্রেম নাই, সেখানে অভ্যুদয় নাই।

কাল-প্রতীক্ষা।

কর্ম্মী হইতে হইলে সহিষ্ণু হইতে হইবে। ডিমে তা' দিতে বসিয়া যদি হংস-জননী ডিম ফুটিল কি না দেখিবার জন্য মিনিটে মিনিটে গাত্রোত্থান করে, ডিম ফোটে না, পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। উনানে হাঁড়ী চাপাইয়া যদি ভাতের জন্য অস্থির হইতে হয়, তাহা হইলে কপালে অসিদ্ধ তণ্ডুলই জোটে। মাছকে জলে জিয়াইয়া অল্পক্ষণ পরে পরে যদি ওজন কতটা বাড়িল দেখিবার জন্য বার বার জল হইতে তোলা হয়, মাছ বাঁচে না। ডাল পুতিয়াই যদি শিকড় গজাইল কিনা দেখিবার জন্য মাটি খুঁড়িতে হয়, গাছ বাঁচে না। কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মীকে অস্থির হইলে চলিবে না। যতটুকু সাধন করিবার আছে, সবটুকু নির্ব্বন্ধ-চিত্তে সমর্পণ করিয়া তাহাকে সিদ্ধির জন্য যথাকাল শান্তভাবে অপেক্ষা করিতে হয়।

লোক-নিন্দা।

লোকে কত কথাই বলিবে, তার জন্য গলায় দড়ি-কলসী বাঁধিয়া কীর্ত্তিনাশায় ডুবিয়া মরিতে হইবে নাকি? তুমি ত' অন্তরে জান, বিন্দুমাত্র স্বার্থবুদ্ধি তোমার নাই। তুমি যে কোন্ পরার্থপ্রেরণায় সর্ব্বসুখ-কামনা মনের জমি হইতে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দিয়াছ, দেশ তাহা যতদিন না বুঝিবে, ততদিন গালাগালি দিবেই। যতদিন তোমার উদগ্র চেষ্টা অব্যর্থ কর্ম্মের মধ্য দিয়া পূর্ণতঃ সার্থক না হইবে, ততদিন লোক

তোমাকে গালি পাড়িবেই, জুয়াচোর বলিবেই ; যতদিন পর্য্যন্ত উপকারের দেনায় প্রত্যেকের মাথাটা তোমার পায়ে কেনা হইয়া না যাইবে, ততদিন নিন্দা করিবেই। জগতের সকল নিন্দুক কখনও মরিয়া যাইবে না, আবার তাই বলিয়া জগতের সকল কীর্ত্তি কখনও লুপ্ত হইবে না।

মন্ত্রের সাধন।

"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন"—এইরূপ সুদৃঢ় সঙ্কল্প চাই। "করিবই"—এই জেদ যে করিতে জানে, সে কার্য্যোদ্ধার করিয়া লয়ই। আর, সন্দেহের দোলায় নিয়ত যে দোলায়মান, সংশয়-বুদ্ধি নিয়ত যাহার কাছা ধরিয়া টানিতেছে, অবিশ্বাস যাহার চক্ষের সম্মুখে কুয়াসার সৃষ্টি করিতেছে, সাফল্য তাহার কাছ হইতে ঠিক ততখানি ঘৃণায় দূরে সরিয়া দাঁড়ায়। পরসাহায্যে অনিচ্ছুক কৃপণ ধনী যেমন করিয়া সাহায্য-ভয়ে দরিদ্রের সান্নিধ্য পরিত্যাগ করে, আত্মপরায়ণ দেহসর্ব্বস্ব ভোগসুখী যেমন করিয়া সংক্রমণ-ভয়ে ব্যাধিগ্রস্তের নিকট হইতে নাসিকা কুঞ্চিত করিতে করিতে দৌড়িয়া পলায়। ছেড়া নেকড়া কোমরে জড়াইয়া ঘুমাইয়া থাকিবে, আর নিশিভোরে জাগিয়া উঠিয়া দেখিবে, তোমার সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণভূষা,—এসব মিথ্যা কল্পনা পরিত্যাগ কর। বিনা খাটুনিতে যক্ষের ধন পাইবার দুরাশা পরিহার করিয়া প্রচণ্ড পরিশ্রমের অবিসংবাদিনী যোগ্যতায় দিগ্বিজয়ের সঙ্কল্প কর। আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপ উপন্যাসের কথা, কঠোর

পরিশ্রম এবং অতুলনীয় প্রতিষ্ঠা লাভই বাস্তবজীবনের চিত্র। বললাভ ব্যায়াম-সাপেক্ষ, বীর্য্যলাভ সঙ্কল্প-সাপেক্ষ, সাফল্যলাভ সাহস-সাপেক্ষ। অলসের আবার প্রতিষ্ঠালাভ কবে ঘটিয়াছে ? আলস্যকে বিষধর ভুজঙ্গেরই ন্যায় দূরে পরিহার করিয়া চল, অক্লান্ত পরিশ্রমকে শিরোমুকুট করিয়া লও। নিশ্চিত জানিও, কলেরা-বসন্ত ব্যাধি নহে, আলস্যই ব্যাধি ; দেহপতন মৃত্যু নহে, আলস্যই মৃত্যু। নিশ্চিত জানিও, পারদের বিষ হজম হইতে পারে, উপদংশের বিষ হজম হইতে পারে কিন্তু আলস্যের বিষ হজম হইবে না। আলস্য যখন তোমার দেহকে শিথিল এবং মনকে সঙ্কল্পভ্রষ্ট করিতে চাহিবে, জানিও, গো-শূকর-মাংসের অন্ন-থালিকা তোমার ওষ্ঠাগ্রে ধৃত হইয়াছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোমার বিদ্রোহী হউক, সকল বন্ধু তোমাকে পরিত্যাগ করুক ; গ্রাহ্য-মাত্র করিও না, বিন্দুমাত্রও চিন্তিত হইও না, একটুও কাতর হইও না, নিজ বাহুবলে নির্ভর কর, সঙ্কল্পের শক্তিতে আস্থাবান্ হও, অনালস্যের শক্তিতে বিশ্বাস কর। পরিশ্রমীর নিঃসঙ্গতায় ভয় কি ? অনলসের একাকিত্বে ভাবনা কিসের ? কর্ম্মই তাহার যথেষ্ট সঙ্গী, সবল বাহুযুগলই তাহার যথেষ্ট বন্ধু।

যথার্থ সন্ন্যাসী।

আজ সত্যই দেশে লক্ষ লক্ষ সর্ব্বস্বত্যাগী পরার্থকারী মহামনাঃ সন্ন্যাসীর প্রয়োজন। ভোজনবিলাসী সন্ন্যাসী নহে, আরাম-প্রয়াসী সন্ন্যাসী নহে, কঠোর-কর্ম্মা মৃত্যু-অগ্রাহ্যকারী,

ব্রহ্মবীর্য্য-সম্পন্ন তেজস্বী সন্ন্যাসীরই আজ প্রয়োজন। নিজ জীবনের কুদৃষ্টান্ত দিয়া যাহারা সন্ন্যাসের অভ্রভেদী গৌরবকে বিলাসসেবী গৃহীর চক্ষেও ছোট করিয়া দেয়, নিজের অনাচার অবিচার ও স্বার্থপরতার দ্বারা যাহারা পবিত্র গৈরিকের উপরে সাধারণের অবজ্ঞা ও বিদ্রূপকেই আকর্ষণ করে, দলে দলে সেই সব লোকঠকান, ফাঁকিবাজ, প্রবঞ্চক সন্ন্যাসী দিয়া দেশের আজ কোন্ কল্যাণ সাধিত হইবে? বুদ্ধ, শঙ্কর ও চৈতন্যের জীবন-সাধনার উত্তরাধিকারী হইয়াও নিজ নিজ অতিচার দিয়া যাহারা তাঁহাদের মহিমাকে কলঙ্কিত করিয়াছে এবং করিতেছে, আজ কি তাহারাই আমার এই দুঃখ-দুর্দ্দশা-পীড়িত হতভাগ্য দেশের উদ্ধার সাধন করিবে? বৈরাগ্য-সাধনের অভাব যাহাদের অন্তর্দৃষ্টিকে খুলিতে দিতেছে না, হৃদয়ের প্রসারের অভাব যাহাদের সাম্প্রদায়িক নীচতাগুলিকে ধ্বংসমুখে যাইতে দিতেছে না, বীর্য্যধারণের অভাব যাহাদের শাস্ত্রার্থ গ্রহণের শক্তিকে ফুটিতে দিতেছে না, এবং সরলতার অভাব যাহাদিগকে সর্ব্ব-সাধারণের আপন হইতে দিতেছে না, হায়রে হায়, দগ্ধ ভারতের তপ্ত বুক কি তাহাদের স্পর্শেই শীতল হইবে? সাধু-গিরির মেকী মুদ্রা বাজারে চালাইতে গিয়াই যে আমরা যথার্থ সাধুদের সম্মান কমাইয়া দিয়াছি, সন্ন্যাসের মিথ্যা ছদ্মবেশে সজ্জিত হইতে চাহিয়াই যে আমরা যথার্থ সন্ন্যাসীকেও ছোট করিয়া দিয়াছি, বৈরাগ্যের কৃত্রিম পতাকা উড়াইতে

গিয়াই যে আমরা যথার্থ ত্যাগীকেও তাঁহার ন্যায্য আসনে অনধিকারী করিয়া রাখিয়াছি, লোক ভুলাইবার জন্য আলখাল্লা পরিয়া বাউল সাজিয়াছি, উদরের তাড়নায় ফকিরীর ফিকির ধরিয়াছি এবং এই ভাবেই যে আমরা সর্ব্বস্ব-সমর্পণকারীর আপ্রাণ উৎসর্গের মূল্য কমাইয়া দিয়াছি, হে তরুণ ভারত, দেশের জন্য, দশের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে আসিয়া আজ এ কথা ভুলিয়া যাইও না, ভুলিয়া যাইও না, স্তূপীকৃত অর্থের হিমাচলে উপবিষ্ট তীর্থের মোহন্ত তোমার আদর্শ নয়, তোমার আদর্শ রাজৈশ্বর্য্য-পরিত্যাগী নিঃসম্বল শ্রীবুদ্ধ। ভুলিয়া যাইও না, মঠ বা আশ্রম নামধারীর তৃণকুটীর বা রাজপ্রাসাদই তোমার গৃহ নহে, প্রয়োজনমত উহারা তোমার কর্ম্মকেন্দ্র হইতে পারে, কিন্তু তোমার গৃহ ঐ দীনদরিদ্রের নিরন্ন অন্ন-শালায়, তোমার গৃহ ঐ লজ্জানিবারণে অক্ষম বস্ত্রহীনের আত্মগোপনের অন্ধকোণে, তোমার গৃহ ঐ ভ্রাতৃবিরোধী আত্ম-বিদ্বেষী নিত্যকলহরত সহোদরের রক্তাক্ত অঙ্গনতলে এবং সর্ব্বোপরি তোমার গৃহ তাহাদের চিরসাহচর্য্যে, যাহারা অজ্ঞতায় আত্মমর্য্যাদা ভুলিয়াছে, অপশিক্ষায় মনুষ্যত্ব হারাইয়াছে এবং একবিন্দু সহানুভূতির অভাবে, এক রতি আদর-সোহাগের অভাবে, একতিল সহৃদয়তার অভাবে অকৃতি ও অকল্যাণকেই চিরবাঞ্ছিত ভাবিয়া নিজের অঙ্গ নিজে দংশন করিতেছে ও নিজের পায়ে নিজে কুঠার হানিতেছে।

ভালবাসার লক্ষণ।

দেশকে ভালবাসিয়াছ কি, জাতিকে ভালবাসিয়াছ কি, দুঃখীকে ভালবাসিয়াছ কি, অধম পতিত অনাথ অশরণকে ভালবাসিয়াছ কি? ভগবানকে ভালবাসিয়াছ কি, ভগবানের প্রীতিপাত্রকে ভালবাসিয়াছ কি? তোমার মুখের কথায় আমি তুষ্ট হইব না,—আইস দেখি লক্ষণ মিলাইয়া নির্দ্ধারণ করি। যাহাকে ভালবাসিয়াছ, তাহার জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু তোমার ফুলিয়াছে? ফুস্‌ফুস তোমার ফাটিয়াছে? প্রতি নিঃশ্বাসে তুমি অসহনীয় বেদনায় অধীর হও?

বন্ধনের মুক্তি।

সংস্কারের নাকাদড়ির টান ছিঁড়িবার সামর্থ্য মানুষের আছে। সমুদ্রস্রোতে বালির বাঁধ অনায়াসে ভাঙ্গিতে পারে। কিন্তু ছিঁড়িবার জন্য, ভাঙ্গিবার জন্য প্রয়াস চাই, অবিরত চেষ্টা চাই।

কথা বনাম কাজ।

কথার জন্য কথা যথেষ্ট হইয়াছে, এখন কাজের জন্য কথা চাই। যে কথা একমাত্র কল্যাণকর্ম্মেরই আকর্ষণে পরিব্যক্ত হয় এবং কল্যাণ-কর্ম্মকেই নিজ জঠরে দশমাস দশদিন সযত্নে ধারণ করিয়া যথাকালে প্রসব করে, তেমন কথা চাই। যাহা শূন্যগর্ভ আস্ফালন মাত্রেই পর্য্যবসিত হয় না, সেই অব্যর্থ অলঙ্ঘনীয়, অমোঘ কথারই আজ প্রয়োজন পড়িয়াছে।

তুমি জাগিয়াছ কি না।

"আমি না জাগিলে দেশ জাগিবে না, আমি না উঠিলে দেশ উঠিবে না"—এইরূপ বিশ্বাস অন্তরভরা না থাকিলে কেহ দেশসেবার অধিকারী হইতে পারে না। আর কেহ জাগিল কি না, আর কতজন এখনও ঘুমঘোরে অচেতন আছে, সে বিচারে তোমার প্রয়োজন নাই, দেশমাতা তোমার কাছে সে হিসাব চাহেন না। তিনি শুনিতে চাহেন, তুমি নিজে জাগিয়াছ কি না। তোমার আঁখির কোণে ঘুমের নেশা আর যে নাই, তোমার সবল পেশল দেহে মোহের জড়তা আর যে নাই, তোমার সরস সতেজ মনে দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা আর যে নাই,—এইটুকু তিনি তোমার অটুট আত্মপ্রত্যয়ের মধ্যে পাইতে চাহেন। তোমার রৌদ্রদীপ্ত কটাক্ষ-রক্তিমায় বজ্র-বিদ্যুতের সূচীসূক্ষ্ম ক্রীড়া দেখিয়া তিনি বুঝিতে চাহেন, আর কেহ না জাগিলেও তুমি নিশ্চয় জাগিয়াছ। তোমার বিলাসকুণ্ঠ সহিষ্ণু শরীরে সহ্যাতীত দুঃখের নির্ম্মম ঘাতচিহ্ন অলোপ্য কৃষ্ণতায় অঙ্কিত দেখিয়া তিনি জানিতে চাহেন, তুমি জাগিয়াছ। অমা-তমিস্রার অন্ধ-নিশীথে প্রেতমূর্ত্তির তাণ্ডব-কলরবের মধ্যে তোমার নির্ভীক হৃদয়ের অচঞ্চল স্পন্দন অনুভব করিয়া তিনি জানিতে চাহেন, তুমি জাগিয়াছ।

দেশ-সাধনা।

আমার হৃদয়, আমার মস্তিষ্ক, আমার চেষ্টা নামে একটা

কিছু আলাদা আছে বলিয়া যেন মনে না করি। দেশ ও জাতির সেবাই যেন আমাময় হইয়া যায়। উহাই আমার ধ্যান, উহাই আমার ধারণা, উহাই আমার ধর্ম্ম, উহাই আমার কর্ম্ম হউক। কোন মানুষকে আমি যেন শুধু একটা মানুষ বলিয়াই ভালবাসিতে না জানি, তাহাকে যেন আমি আমারই অংশস্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করি। দুর্ভিক্ষদমনে অগ্রসর হইয়া আমি যেন না ভাবি যে, আমি পরের উপকার করিতেই যাইতেছি। আমারই বৃহত্তর জঠরের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য যে আমি আকুল প্রাণে ঐ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত স্থানে ছুটিয়াছি, এই কথাই যেন আমার অন্তর জুড়িয়া বিরাজ করে। দেশব্যাপী জলপ্লাবনে বা ঝড়-ঝঞ্ঝায় আমি যেন আমারই বৃহত্তর প্রাণকে বিপন্ন দেখি, মহামারীর আবির্ভাবে আমি যেন আমারই বৃহত্তর জীবনকে মরণোন্মুখ দেখিয়া আতঙ্কিত হই। ব্যক্তিবুদ্ধি যেন আমার মন হইতে একেবারে মুছিয়া যায়, সমষ্টিবুদ্ধি যেন আমার সমগ্র জুড়িয়া ঠাঁই লয়।

শক্তিমানের ইচ্ছা।

এতদিন পার নাই বলিয়া জীবনেই যে পারিবে না, তাহা কে বলিল? তিল তিল করিয়া তোমাকে শক্তিসঞ্চয় করিতে হইবে,—যে ইচ্ছায় প্রতিহত হইয়া ইস্পাত বাঁকিয়া যায়, বজ্র ভাঙ্গিয়া যায়, তেমন ইচ্ছাশক্তি তোমাকে যুগব্যাপী তপস্যার বলে লাভ করিতে হইবে। মরুভূমিতেও আমি গাছ দেখিয়াছি,

সাগরেও আমি দ্বীপ দেখিয়াছি, পাহাড়েও আমি হ্রদ দেখিয়াছি। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যায়, মরীচিকা দেখিয়া যেখানে পথ হারাইতে হয়, সাহারার সেই বালুকাবিস্তারেও কি সুশীতল জলের প্রচ্ছন্ন মরুপ্রস্রবণ নাই, নয়নানন্দ মরুকুঞ্জ নাই? জলধির জল যেখানে অতল, তাহারই বুকের উপরে মরকত মালার মত অগণিত দ্বীপপুঞ্জ কি ভাসিয়া উঠে নাই? দিকে দিকে যেথা পথ অলঙ্ঘ্য, দুর্গম গিরির সেই বন্ধুর বক্ষে সরসীর অমল সলিলে শত শতদল কি ফুটিতে জানে না? যাহাকে এমন নীরস ভাবিতেছ, তাহা হইতেও শর্করা নিষ্কাশিত করিতে হইবে। আত্মশক্তির বন্ধ্যাত্ব ঘুচাইয়া, তাহাকে প্রাণান্ত সাধনায় সন্তানপ্রসূ করিয়া তুলিতে হইবে। যাহাকে অসম্ভব বলিয়া লক্ষ জনে ছাড়িয়া গিয়াছে, তাহাকেই সম্ভব করিবার জন্য তোমাকেই শক্ত হইতে হইবে। তুমি যে মানুষ, সেই কথা আজ ভুলিও না। অব্যর্থ কর্ম্মপ্রয়াসে বিশ্ববিঘ্ন পদাহত কর। ভুলিয়া যাইও না,—শক্তিমানের ইচ্ছার সমক্ষে কারাপ্রাচীর ধ্বসিয়া যায়, গিরিশৃঙ্গ নুইয়া পড়ে।

দায়ী কে?

পরকে অপরাধ দিও না ভাই, তোমার যাবতীয় অধঃপতনের জন্য তুমি দায়ী, তুমিই দোষী। প্রতিদ্বন্দ্বীর হৃদয়ে দয়ামায়ার স্থান কোথায়? সবল কখনও দুর্ব্বলের কাছে পরাভব মানিতে চাহে কি? তাহার অন্তর্নিহিত আত্মপ্রত্যয় তাহাকে নির্নিমেষ

প্রভুত্বে জাগ্রত রাখে। কাহারও কাছে সে মাথা অবনত করিবে না, কাহারও কাছে ন্যূনতা স্বীকার করিবে না, সদম্ভে—সগর্ব্বে—সদর্পে—উদ্ধত বাহুবলে বিশ্ববিজয় করিয়া তাহাকে নিঃশেষে ভোগ করিতে চাহিবেই। এইজন্য তাহাকে দোষ দিলে চলিবে কেন?—দোষ দাও নিজেকে; ধিক্কার দাও, আপনার নিয়ত পরাজয়োন্মুখ অসীম দুর্ব্বলতাকে; ঘৃণা কর, নিজের সেই মর্য্যাদাবুদ্ধিবর্জ্জিত জঘন্য ভিক্ষাবৃত্তিকে,—যাহা প্রতিনিয়ত তোমার ভ্রষ্টাবশিষ্ট মনুষ্যত্বটুকুকে নিঃস্ব নিরাশায়, পুঞ্জীভূত আত্ম-অবিশ্বাসে, দাসসুলভ পরপরীবাদে মিথ্যা করিয়া দিয়াছে!

যথার্থ ঐক্য।

কথার ঐক্য ত' ঐক্য নহেই, এমন কি কর্ম্মের ঐক্যও সকল সময় ঐক্য নহে। এক রকমে টিকি ঝাড়িলে বা দাড়ি নাড়িলেই ঐক্য হয় না। যাহাদের লক্ষ্য এক, আদর্শ এক, শুধু তাহাদেরই মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হইতে পারে। এককর্ম্মী হইলেই যথার্থ ঐক্যের যোগ হইল, তাহা নহে। এককর্ম্মী হওয়া, আর সমকর্ম্মী হওয়া পৃথক্ কথা। যাঁহারা বিভিন্ন উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হইয়া একই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা এককর্ম্মী। আর যাঁহারা একই উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হইয়া একই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা সমকর্ম্মী। সমপ্রাণ, সমভাব, সমচিত্ত ও সমবুদ্ধি না হইলে কেহ সমকর্ম্মী হইতে

পারে না। আবার সমাদর্শ না হইলে সমপ্রাণতা বা সমচিত্ততা আসিতে পারে না। দেশ জুড়িয়া কি এক কথা লক্ষ লোকে বলে নাই? একই কাজে কি লক্ষ লোক লাগে নাই? কিন্তু তাহাতে প্রকৃত কল্যাণ কখনই জাগ্রত হইবে না, যদি সকল কথা ও সকল কর্ম্ম, একই আদর্শের দ্বারা পরিচালিত না হয়। আদর্শ এক হইলে, মানুষ এককর্ম্মা বা একবাক্য না হইলেও তাহাতে কিছু যায় আসে না। আদর্শের ঐক্যই হইল ঐক্যের প্রাণ। জোড়াতালি দিয়া একটা কিছু কর্ম্মতালিকা খাড়া করিয়া দেশের সকলকে সেই একই কর্ম্মের জোয়ালে জুতিয়া দিলেই ঐক্য আসিবে, এমন মনে করা ভুল। সকলকে একই কর্ম্মে আগ্রহবান্ ও যত্নশীল করিবার চেষ্টাও বৃথা। যদি কেহ সকলের মনের পটে একই আদর্শের ছবি আঁকিয়া দিয়াও, যার যার নিজের নিজের ওজনমত যথোপযুক্ত কর্ম্ম মাপিয়া লইবার স্বাধীনতা দিতে পারেন, তবে তিনিই কেবল যথার্থ ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইবেন। খাঁটি আদর্শ কখনও হীনাঙ্গ বা সঙ্কীর্ণ হইতে পারে না। তাই, তাহার অনুযায়ী অনুকূল কর্ম্ম বা কর্ম্মপন্থারও সংখ্যানির্দ্দেশ কেহ কর গণিয়া করিয়া দিতে পারে না। যাহা বিরাট, তাহাকে লাভ করিতে যাইয়া মানুষ বিচিত্র প্রয়াসেই আত্মজীবন সার্থক করিবে। প্রাণবল্লভ শ্যামসুন্দরের অঙ্গপরশ পাইবার জন্য কেহ বিরস বদনে ধূলায় লুটাইবে, কেহ আকুল অন্তরে মাধবী-কুঞ্জে ছুটিবে, কেহ বা

তাঁহার চরণচিহ্ন খুঁজিয়া খুঁজিয়া যমুনার কুলে নীপকুঞ্জ-মূলে আসিয়া দাঁড়াইবে। যে যেমন করিয়া পারে, তার প্রাণপ্রিয়ের সন্ধান করিয়া লইবে। এই বৈচিত্র্য আছে বলিয়া প্রেমের মূল্য কমিয়া যাইবে না। যেখানে আমরা সকল বিচিত্রতাকে গলা চাপিয়া মারিতে চাহি এবং গায়ের জোরে সকলকে এককর্ম্মা করিতে চাহি, সেখানে যথার্থ ঐক্য কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত হয় না, ঐক্যের ছদ্মমূর্ত্তিতে ঘোরতর অনৈক্যই রাজসম্পদে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করে। একলক্ষ্যতা লক্ষ বিচিত্রতার মধ্য দিয়াও অটুট রহিতে পারে এবং রহিবে বলিয়াই জগতের সকলে কখনও হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, ইহার যে-কোনও একটামাত্র ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া যায়ও নাই, যাইবেও না; এবং এইজন্যই জগতে নিত্য নূতন ধর্ম্মমতের উদ্ভব ও সম্প্রদায়ের প্রসার হইতে থাকিবে। আপনার গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়াও মানুষ অপরের সহিত সমচিত্ত হইবে, সমপ্রাণ হইবে, সমাদর্শ হইবে। সমাদর্শতার আত্মা হইল স্বাধীন ইচ্ছা। এই স্বাধীন ইচ্ছা আহত হইলে, জগতের মাটিতে শুধু কপটতা, খলতা ও মিথ্যারই চাষ হইবে, মিথ্যাই ফলফুলে সুশোভিত হইবে, মিথ্যারই কতশত বীজাঙ্কুরে সৃষ্টি ছাইয়া ফেলিবে।

বড় হইবার পথ।

বড় হইবার আকাঙ্ক্ষা গায়ের জোরে মনের মাঝে গুঁজিয়া দিলে এবং বড় কাজের মাঝে মনকে নির্ম্মমভাবে ঠেলিয়া

ফেলিলে আপনিই মানুষ বড় হয়। বড় হইয়া বড় কাজে নামিব, ধনী হইয়া দান করিব, রাজা হইয়া দিগ্বিজয় করিব, এইরূপ ভাবিলে কখনও মানুষ বড় হইতে পারে না। দৈব আসিয়া তোমাকে বড় করিয়া দিয়া যাইবে, এমন পুরুষত্বহীন পঙ্গু বিশ্বাস মনের কোণেও রাখিও না। অসীম কর্ম্মসহায়ে, অক্লান্ত অধ্যবসায়ে, জগতের শ্রেষ্ঠ গৌরব কাড়িয়া আনিতে হইবে; দেবতা বা মানুষের কাছে ভিক্ষা করিয়া তাহা অর্জ্জন করিতে পারিবে না। দুর্দ্দমা আকাঙ্ক্ষাকে একমাত্র সাথী করিয়া নির্ভয়ে কর্ম্মপথে অগ্রসর হও। যাহাদের নাম শুনিলে লোকে শ্রদ্ধায় মাথা নত করে না, যাহাদিগকে দেখিলে সসম্মানে পথ ছাড়িয়া দেয় না, তেমন নগণ্য মানুষ হইতে চাহিও না। দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হওয়া চাই, দেশের মধ্যে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়ান চাই, কোনও সম্প্রদায়-বিশেষেরই মধ্যে নহে—সকলের মধ্যে বড় হওয়া চাই। দশজনে যাহাকে চিনিল না, মানিল না, জানিল না, তেমন হইতে চাহিও না। যাহার মৃত্যুতে সমগ্র দেশবাসী শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়ে না, তেমন তুচ্ছ মানুষ হইবার অপমান সহ্য করিও না। যেমন করিয়া হউক তোমাকে বড় হইতেই হইবে; যতদিনেই হউক, তোমাকে শির তুলিয়া সগৌরবে দাঁড়াইতেই হইবে,—এই প্রেরণায় অহর্নিশ উদ্বুদ্ধ হইয়া থাক। বাঁচিয়াই হউক, আর মরিয়াই হউক, জনগণের বরেণ্য তোমাকে হইতেই হইবে। অকলঙ্ক পবিত্রতার পুণ্যময়ী

বেদিকায় তোমার অভ্রভেদী মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে! শত বিঘ্ন পদতলে চাপিয়া বজ্রকণ্ঠে এই কথাই বল,— "আমি বড় হইবই, আমি মানুষ হইবই,—কোনও বিপদকে গ্রাহ্য করিব না, কোনও বাধার কাছে মাথা নোয়াইব না।"

কর্ম্ম-রহস্য।

মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় যাহারা সমরাঙ্গনে ঝাঁপাইয়া পড়ে, তাহারা একটীবারও ভাবিয়া দেখিবার অবসর পায় না যে, বাস্তবিক তাহারা কাঁহার ইঙ্গিতে জীবনকে তৃণময় জ্ঞান করিতে পারিয়াছে, অথবা তাহাদের আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়া কোন্ নারায়ণের পূজা হইবে। কিন্তু যাহারা বিন্দু বিন্দু করিয়া রক্ত ঢালে আর, প্রত্যেকটী শোণিতকণার সঙ্গে বিশ্বহিতের অকপট ইচ্ছা প্রেরণ করে, তাহাদের আর অগোচর রহে না, কাঁহার আদেশকে নতমস্তকে মানিয়া লইতে তাহারা অসীম কষ্ট যাচিয়া লইল, কাঁহার অলঙ্ঘ্য শুভ ইচ্ছা তাহাদের জীবনকে অসামান্য লাঞ্ছনার মধ্য দিয়া মহিমান্বিত করিয়া তুলিল। তেমনই, যদি বিশ্বের সেবা করিতে চাও, তিল তিল করিয়া নিজেকে উৎসর্গ করিতে হইবে। মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্যের বিবেচনাকে অগ্রাহ্য করিয়া যথেচ্ছ একটা-কিছুর অনুষ্ঠানেই চলিবে না। সংসারের হীন বন্ধন হইতে যদি নিজেকে মুক্ত করিতে চাও, তাহা হইলে একটা উচ্ছ্বাসেরই নীচে তলাইয়া যাইও না। অল্প অল্প করিয়া নিজেকে বিযুক্ত করিয়া লইতে

থাক। তুচ্ছ যাহা, গুণিত হইয়া তাহাও গ্রাহ্য হয়, কিন্তু বৈশাখের ঝড়ঝঞ্ঝা উঠিতেই বা কতক্ষণ, থামিতেই বা কতক্ষণ?

দেশের কাজ।

উত্তেজনায় গঠন হয় না, ধ্বংস হয়। উচ্ছ্বসিত প্রবাহ দুকুল ভাঙ্গিয়া যায়, ধীরবাহিনী গভীরা থাকে। যদি দেশেরই কাজ করিতে চাও, সে কাজ হইবে—আগুন জ্বালিবার শক্তিতে নয়, প্রজ্বলিত অগ্নিপিণ্ডকে অক্লেশে করতলে ধারণ করিবার ক্ষমতায়। কর্ম্মী যাঁহারা, তাঁহারা ধীর, স্থির, চিন্তাশীল ও সহিষ্ণু।

আস্তিক ও নাস্তিক।

"ঈশ্বর নাই"—একথা যাহারা প্রচার করে, তাহাদের বিরুদ্ধতা করিয়া বচন ঝাড়িলেই আমি আস্তিক হইতে পারি না। রাস্তার চৌমাথায় দাঁড়াইয়া "ঈশ্বর আছেন", একথা বলিয়া উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিলেও আমি আস্তিক হইতে পারি না। ফোঁটা-তিলক কাটিলে, টিকি রাখিলে, গৈরিক পরিলে অথবা রুদ্রাক্ষ ধারণ করিলেই যদি আস্তিক হওয়া যাইত, তবে বিশ্বজোড়া এত অসন্তোষ দেখিতে পাইতাম না, এত হাহাকার শুনিতাম না, "দগ্ধ-বিধি" বলিয়া ঘরে ঘরে ভগবানের নামে অনুযোগ, অভিযোগ, নিন্দা হইত না। আস্তিক যিনি, তিনি কি দুঃখ দেখিয়া ভয় পান? তাঁহার বুকের স্পন্দনে তিনি যে ভগবান্‌কে অনুভব করিতেছেন, নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে তিনি যে

তাঁরই স্পর্শ পাইতেছেন। তাঁর ভগবান্ সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, আলোকে অন্ধকারে, সর্ব্বত্র সর্ব্বদা আছেন। তাই, তিনি পারিয়া বা পঞ্চম, ভাঙ্গী বা দোসাদ, চণ্ডাল বা মেথর বলিয়া কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারেন না,—সকলকেই সেই অখণ্ড-নারায়ণের খণ্ড-বিগ্রহ জানিয়া শ্রদ্ধায় সেবাপর হন। কোটি কোটি নরনারীর ছায়াকে আমরা অশুচি অস্পৃশ্য বলিয়া বিজাতীয় ঘৃণায় দূরে রাখিয়া চলি, আমাদের আবার আস্তিক্য কোথায়? আমাদেরই ভাই-বোনগুলি যখন অজ্ঞতার নিরানন্দ অন্ধকারে পথ না পাইয়া মৃত্যুর করাল গহ্বরে গড়াইয়া পড়িতেছে, তখনও আমরা তর্কযুদ্ধে বিশ্বজয় করিতেছি,—আমরা আস্তিক কিসে? আমাদেরই আপনার জনগুলি ক্ষুধায় ক্লিষ্ট হইয়া চক্ষুর সম্মুখে দাপাইয়া মরিতেছে, অথচ আমরা নিশ্চিন্ত-চিত্তে শিশ্নোদরের সেবায় মজিয়া রহিয়াছি;—আমরা আস্তিক কেমনে? আস্তিক্যের সকল অভিমান কুলার বাতাসে দূর করিয়া দিয়া উহাদেরই জন্য জীবন সঁপিয়া না দিলে প্রকৃত আস্তিক্য কখনও আসিবে কি?

ছোটলোক কাহারা?

যাহারা আমাদিগকে অন্ন দিয়া পুষ্ট করিয়াছে, সম্মান দেখাইয়া বড় করিয়াছে, আমরা তাহাদিগকে পশু অপেক্ষাও অধম মনে করিয়াছি, অস্পৃশ্য বলিয়া বিজাতীয় ঘৃণায় চিরকাল

দূরে রাখিয়া চলিয়াছি। বল ত' দেখি ছোটলোক কাহারা? ইহারা, না, আমরা?

উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত!

দেশকে তুলিতে হইলে আগে নিজে ওঠ। দেশকে জাগাইতে হইলে আগে নিজে জাগ। বিলাস-লালসার সুখ-শয্যায় শয়ান থাকিয়া ভাবিও না বন্ধো, তোমার বাঁশীর রবে যমুনায় উজান বহিবে। আত্ম-সুখের ঘুণে-ধরা বাঁশের বাঁশী তুমি যত করিয়াই সাধ না কেন ভাই, নিশ্চিত জানিও তোমার আহ্বানে একটী ব্রজবাসীরও প্রাণ আকুল হইবে না,—ভোগ-লুব্ধতাই তোমার সকল সাধনায় বাদ সাধিবে। যাহাদিগকে মুগ্ধ করিতে চাও, জানিও বন্ধো, মোহাবিষ্টের প্রভাব তাহা-দিগকে অভিভূত করিতে পারিবে না। যাহাদিগকে আপন করিতে চাও, জানিও বন্ধো, স্বার্থপরের বুকের স্পর্শ পাইতে তাহারা চাহিবে না। যাহাদিগের প্রতিনিধি সাজিতে চাও ভাবিও না ভাই, তাহারা তোমার বক্তৃতার বহর দেখিয়াই তোমাকে বিশ্বাস করিয়া ফেলিবে। ইহাদের কল্যাণের জন্য নিজের কল্যাণকে তুচ্ছ বিবেচনা করিতে শিখিয়াছ কি? ইহাদের উদ্ধারের জন্য নিজের মুক্তিকে অস্বীকার করিতে পারিয়াছ কি? যখন তুমি উদর পুরিয়া আহার কর, গোদুগ্ধে স্নান কর, আর বেদানার রসে তৃষ্ণা মিটাও, একদিনও কি সেই সময় নিরন্ন লক্ষ কোটি ভ্রাতাভগ্নীর ক্ষুধাতুর করুণ মূর্ত্তি মনে

করিয়া দুই ফোঁটা চখের জল ফেলিয়াছ বন্ধো ? ইহা যদি করিতে না পারিয়া থাক, তবে এ স্বদেশপ্রীতির অভিনয় কেন ভাই ? তবে এ বিশ্বপ্রেমের আড়ম্বর কেন বন্ধো ? তোমার চঞ্চল রসনা আজ স্তব্ধ হউক, নিজে আগে ত্যাগী হইতে শিখ, আগে নিজের নিদ্রিত মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করিয়া লও, নতুবা তোমার মত প্রতারকের স্বদেশপ্রীতিতে, তোমার মতন প্রবঞ্চকের বিশ্বপ্রেমে দেশের ও জগতের কি আসে যায় ?

জীবনের সফলতা।

স্তুতির শেফালি-বর্ষা তোমার আপাদমস্তক পরিস্নাত করিয়া দিতে পারে, কিন্তু তাহাই তোমার সাফল্যের প্রমাণ নহে। লোকে তোমাকে অভিনন্দনের পুষ্পমাল্যে সম্বর্দ্ধিত করিতে পারে, কিন্তু তাহাও তোমার সার্থকতার প্রমাণ নহে। প্রকৃতই তোমার জীবন সফলতায় বিমণ্ডিত হইয়াছে কিনা, তাহার অকাট্য প্রমাণনিচয় তোমার আপন অন্তরে পুঞ্জীকৃত রহিয়াছে। সেখানে প্রবেশ কর এবং নিজেকেই নিজে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, তোমার অপ্রকাশ্য জীবনের প্রকৃত মূর্ত্তিটীকে পূজা করা চলে কিনা। সকলে মিলিয়া দুন্দুভি-নাদে তোমার ত্যাগের মহিমা ঘোষণা করিলেই যে তুমি ত্যাগী হইয়াছ, তাহা মনে করিও না। একান্তে একবার আপন হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, প্রকৃতই সে নিজেকে সর্ব্বত্র সকলের জন্য বিলাইয়া দিতে অকৃপণ রহিয়াছে কি না। যাহারা প্রার্থী, যাহারা

সহকারী অথবা যাহারা সরলপ্রাণ সহজবিশ্বাসী, তাহাদের প্রশংসা পাইয়াই মনে করিও না, প্রকৃতই তুমি প্রশংসার যোগ্য হইয়াছ। হয়ত তোমার জীবন-কথা ইতিহাসের পাতায় পাতায় সোণার আখরে লিখিত হইবে, হয়ত তোমার সমাধি-মৃত্তিকার উপরে অভ্রভেদী স্মৃতিমন্দির নির্ম্মিত হইবে, কিন্তু তাহাতেই বলা চলে না যে, প্রকৃতই তুমি মানুষ হইয়াছ, প্রকৃতই তুমি মহৎ হইয়াছ। কারণ, বাহিরের জীবনটা অপেক্ষা ভিতরের জীবনটা অনেক বড় এবং অন্তরে যদি মহৎ না হইতে পার, তাহা হইলে বাহিরের গৌরব একটা গৌরবই নহে।

সার্থকতা।

বুঝিলাম, তোমার আঁখিপাতের আড়াল হইতে রূপের জ্যোৎস্না চুয়াইতেছে ; বুঝিলাম, তোমার মুখের হাসি ভূস্বর্গের নিসর্গ-শোভা ছড়াইয়া দিয়াছে ; বুঝিলাম তোমার শারীর শক্তি দশের বিস্ময়-দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে ; বুঝিলাম, তোমার মেধা-মনীষা সকলের বুদ্ধি-গৌরব ঢাকিয়া দিয়াছে ; বুঝিলাম, তোমার ঐশ্বর্য্যরাশি সোণার পাতে জগৎ মুড়িয়া রাখিয়াছে ; কিন্তু তাহাকে দিয়া আমি কি করিব, ভগবানের কাজে যে আসিতে না চাহিল ? আমরা ব্রজের বালা, আমাদের সব-কিছু ব্রজনন্দনেরই পায়ের তলায় ঢালিয়া দিতে হইবে। যে রূপরাশির বালাই লইয়া নিমেষে শতবার গরবে কাঁপিয়া মরি, তাহা যে তাঁহাকেই দিতে হইবে। যে-দেহের অভিমানে ধরাকে সরা

বলিয়া গণনায় আনি না, তাহা যে তাঁহারই জন্য। আমার মেধা, আমার মনীষা, আমার সুখ, আমার সম্পদ, সকলই যে তাঁহারই দেওয়া; সকলেরই মাঝে যে তিনিই তাঁর চপল-চরণে নূপুর বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছেন! এই যে আমার যৌবনের বান, এ বান আমার জন্য নয়, আমার চিন্তাপহারী হৃন্তাপহারী হরি এই জলকল্লোলে নৌ-বিলাস করিতেছেন। এই যে আমার হাসির ফোয়ারা, তার নিঝর-রবে যে তিনি তাঁর চিরসাধের সাধা সেই বাঁশের বাঁশীটাই বাজাইতেছেন, বাজাইয়া বাজাইয়া আমাকে প্রেমে পুলকে সোহাগে ঢল ঢল করিয়া তুলিতেছেন। তিনি যে আমার যা-কিছু সব। তিনি যে আমার বিদ্যা, বুদ্ধি, ধ্যান, ধারণা, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। যা-কিছুর আমি ভরম করি, সকলই যে তাঁর একার, সে যে আর কারও নয়! আমার সবই যদি তাঁর পায়ে লুটাইয়া না দিতে পারিলাম, তবে এইসব লইয়া আমি কি করিব? তাঁর সোহাগের জিনিসগুলি যদি তাঁরই সোহাগে না সঁপিলাম, তবে আমি এই রূপের বোঝা, গুণের বোঝা, মানের বোঝা, মর্যাদার বোঝা কোথায় বহিয়া লইয়া যাইব, কতদিন বহিতে পারিব, আর কেমন করিয়াই বা বহিব?

পুরাতন্ত্রী-কথা।

বর্ত্তমানের বিচার করিতে বসিয়া অতীতকে একেবারে উপেক্ষাই করিতে পারি কৈ? বিগতের বিস্মৃত কথা মনে

পড়িলে আজ এই বিদগ্ধ বর্ত্তমান দেখিয়া অশ্রুসম্বরণ করি কি করিয়া ?—অবগুণ্ঠিতা উষার গগন-বিলম্বিনী স্বর্ণরেখা ভারতের দগ্ধ-নয়নে অমৃতের স্নিগ্ধ জ্যোতির অক্ষয় অঞ্জন আঁকিয়া দিয়াছিল, মুক্ত বিহগের আকুল কাকলী কর্ণরন্ধ্রে অমরতার মুক্তধারা বর্ষণ করিয়াছিল। তখনই সে পুলকস্পন্দিত ছন্দে গাহিয়াছিল,—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ"—

—'গভীর অন্ধকারের পরপার হইতে আমি সেই পরম পুরুষকে জানিয়াছি, যিনি মহান্, যিনি জ্যোতির্ম্ময়।' দূরাগত বংশীধ্বনি শুনিবার জন্য তাপমুগ্ধ কৃষ্ণসার মৃগ যেমন করিয়া কাণ পাতিয়া থাকে, তেমনই অভিনিবিষ্ট শ্রবণে প্রাচীনের সাধক শুনিয়াছিলেন,—মামেকং শরণং ভজ,—আমাকেই শরণ লও।" সৌন্দর্য্যের-শিশু ভারত-ঋষির সূক্ষনেত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছিল জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার একটা অচ্ছেদ্য অনতিক্রম্য সম্বন্ধ। তিনি জানিয়াছিলেন, আপনার অস্তিত্বকে পরমাত্মার অনন্ত সত্তায় নিঃশেষে নিমজ্জিত করিয়া দেওয়াই জীবনের চরম সার্থকতা। তিনি বুঝিয়াছিলেন,—এই মহা-নিমজ্জনের চেষ্টার সাফল্যের মূলে রহিয়াছে নিরহঙ্কার ফলাকাঙ্ক্ষাবিহীন, অকপট আত্মত্যাগ এবং সর্ব্বকর্ম্মপ্রচেষ্টায় অমিশ্র ভগবদ্‌বুদ্ধি। তাই, তিনি আপনার সমগ্র অস্তিত্বটাকে

একটা ভাগবতী প্রেরণায় ওতপ্রোত দেখিয়াছেন, দেখিয়া আকুল ও বিহ্বল হইয়াছেন, কখনও আপন আনন্দে আপনি মজিয়া আত্মহারা হইয়াছেন, আবার কখনও ভাব-গদগদ কণ্ঠে সে আনন্দের মধুময়ী বারতা বিশ্ববাসীর কাণে কাণে প্রাণে প্রাণে বিলাইয়াছেন,—তাই তিনি কবি, তাই তিনি ঋষি। অপার দুঃখেও কি তাঁহার সে প্রেরণা উছলিয়া উঠে নাই? অসহ যাতনায় আর অসীম লাঞ্ছনায় তাঁহার সে সত্যোপলব্ধি কি প্রকটতর হইয়া ফোটে নাই। আঁধার তাঁহাকে আলোকের সন্ধান বলিয়া দিয়াছিল, দুঃখ তাঁহাকে সুখের সৌধ গড়িয়া দিয়াছিল। তাই, সেদিন অভাব থাকিলেও নিদারুণ হাহারব ছিল না, ক্ষুধা থাকিলেও অক্ষম ক্রন্দন ছিল না, প্রতিযোগিতা থাকিলেও দেশজোড়া প্রতপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ছিল না, বলবান্ থাকিলেও লাঞ্ছিত দুর্ব্বলের বিগলিত অশ্রুপ্রবাহ ছিল না। নিজেরই ভিতরে ভগবান্‌কে পাইয়াছিলেন বলিয়া অভাবগ্রস্ত সেদিন অভাবে মুসড়িয়া যাইতেন না, দারিদ্র্যে নুইয়া পড়িতেন না, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হইয়াও পরাঙ্মুখ হইতেন না, সত্যের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে ক্ষুব্ধ সিংহের মতই দাঁড়াইয়া তিনি শত দুর্ব্বলতার মধ্যেও বিশ্বাসের বীর্য্যে মহাশক্তির উন্মেষ আনিতেন।

মানুষ কোথায় পাই?

তুমি কি মানুষ চিনিতে চাও ভাই? যদি চাও, অসীম

উৎসাহে কর্ম্ম-সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড় । যাঁহারা কর্ম্মী, তাঁহাদের বুকের কাছে যাইয়া দাঁড়াও। মানুষ কি কথায় চেনা যায়? বারাঙ্গনার মত প্রেমের ভাষা কে আর জানে? যাত্রার ভীমকে শৌর্য্যেবীর্য্যে কে পরাস্ত করিবে? কিন্তু সেখানে কি আস্থা স্থাপন করিব? বরং যেখানে মানুষ কথাকে সংযত করিয়া কাজকে বাড়াইয়াছে, সেখানে যাইও। যেখানে কর্ম্মের কঠোর পীড়নে হৃদয়ে হৃদয়ে রাবণের চিতা জ্বলিতেছে, কেবল সেখানেই মানুষ পাইবে। যেখানে দেখিবে, কর্ত্তব্য পালন করিতে যাইয়া বজ্রাঘাতে বিশ্বনাথের মন্দির-চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কেবল সেখানেই মানুষ মিলিবে। শত বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া উত্থানের চেষ্টা যেখানে, মানুষ সেখানেই থাকে। তাহারা কি খোলাম কুচি যে, যেখানে সেখানে হাটে বাজারেই পড়িয়া থাকিবে?

অশ্রুাভরণ।

তিনি কি দিব্যনয়না নহেন, আঁখিতে যাঁহার অঞ্জন নাই কিন্তু অশ্রুপ্রসর যাঁহার পতিতের সকল মলিনতা ধৌত করিতে জানে? প্রকৃতই কি তিনি অনলঙ্কৃতা, রিণিকি-রোলে চরণে যাঁহার নূপুর-রাগিণী বাজে না, কিন্তু করুণার কুলু-কল্লোলিনী যাঁহার পদনখ চুম্বিয়া যায়? দরিদ্ররূপে যাঁহারা জ্বলন্ত জাগ্রত নারায়ণ, তাঁহাদের দেখিয়া যাঁহার মরমকুঞ্জে স্নেহমঞ্জরী ফুটিয়া উঠিল, স্তনযুগে যাঁর নিমেষের মাঝে সন্তান-শিহরণ জাগিয়া

উঠিল, "আয়রে আমার সোণা, আয়রে আমার বাছা, আয়রে আমার বুকজোড়া ধন"—বলিয়া যিনি ছুটিয়া যাইয়া দীনাতিদীনকেও পরম প্রেমভরে টানিয়া আনিয়া বুকে চাপিয়া ধরিলেন, তিনি কি নিরাভরণা? কোটি কোটি পুত্রকন্যার দুর্ব্বল বাহুযুগ যাঁহার গ্রীবাদেশ বেড়িয়া আছে, স্বর্ণহারে তাঁর কোন্ প্রয়োজন? জগন্ময় ক্ষুধাক্লিষ্ট সন্তান-সন্ততিকে নিজ হাতে যিনি একগ্রাস অন্ন বিলাইতে পারিলেন, কনক-বলয়ে তাঁর কি আর গৌরব? জননীর স্নেহস্নিগ্ধ সিক্ত দৃষ্টিতে একবার যিনি আমাদের দিকে তাকাইয়াছেন, আমাদের এই কঙ্কালসার ক্ষীণমূর্ত্তি যাঁহার পরাণে দীর্ঘনিঃশ্বাসের ঝঞ্ঝা বাজাইয়াছে, তিনি যে কেমন সুন্দর, তিনি যে কেমন মধুর, একথা কেমনে কহিব?

শান্তি।

যিনি শান্ত, শান্তি তাঁহারই আছে; যাহারা অশান্ত, তাহাদের শান্তি কোথায়? অতৃপ্ত বাসনার উদ্দাম তাড়নে অশান্ত অন্তরে ছুটাছুটি করিতেছে, তাহার যে শান্তি আছে; ইহাই বা স্বীকার করিব কেমনে? যেমন অভাবই আসুক না, দুঃখ যতই বাড়ুক না, ইহাকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইবার সাহস যদি আমার না থাকে, নিজেকে তবে শান্ত করিয়া পরিচিত করিতে পারি কৈ? সহ্য করিবার মনোবল অটুট অব্যাহত থাকিবে, তবেই ত' আমি শান্ত হইতে পারিব! সকল বেদনাকেই যদি স্বীকার করিতে পারি, সকল বোঝাকেই যদি

মাথা পাতিয়া লইতে পারি, তবেই ত' আমি শান্তির অমৃতরস আস্বাদন করিতে সৌভাগ্যবান্ হইব! কারণ, মানুষের মন যখন অন্তরের রসে ডুবিয়া রহিতে চাহে, তখনই সে বাহিরের কশার প্রতি দৃক্‌হীন হইতে পারে। রূপের ধারা, রসের ধারা, খরস্রোত স্রোতে বহিয়া চলিয়াছে, বাহিরের বিক্ষিপ্ত দৃষ্টিতে আমরা সেই স্রোতোধারার বিক্ষিপ্ত বিকাশ বিভিন্ন পর্য্যায়ে দেখিয়া ক্ষণে চঞ্চল, ক্ষণে সন্দিগ্ধ হইয়া পড়িতেছি এবং সুখ-দুঃখের মিথ্যা সংস্কার গড়িয়া হাসিতেছি, কাঁদিতেছি অথবা নিত্যরসামৃতস্বরূপ সেই সত্যসুন্দর ভগবানের অখিল অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিয়া মিথ্যা যুক্তির কল্পিত ইন্ধনে দারুণ অনলকুণ্ড জ্বালিয়া পতঙ্গের মত তাহাতেই দগ্ধিয়া মরিতেছি। ঐ যে দেখিলাম, ইন্দ্রধনুর মত সপ্তবর্ণের দীপালীঘেরা সুখের কোমল কমনীয় কামামূর্ত্তি, তাহাকে কি জীবনের বিনিময়েও পাইব না? আবার ঐ যে বিরূপ বিভীষিকার বিষন্ন বিদ্রূপ লইয়া শনিগ্রহের মতন ধূম্রলোচন রাক্ষস বিরাট মুখব্যাদান করিয়া ত্রস্তপদে ছুটিয়া আসিতেছে, তাহার আক্রোশ হইতে কি আত্ম-রক্ষা করিতে পারিব না? স্বপ্নেরই ঘোরে এমনই কত কি ভাবিয়া আকুল হই, কিন্তু একবারও ত' ভাবিয়া দেখি না, এই যে কত কাঁদিলাম, এই যে কত চাহিলাম, এই চাওয়া-কাঁদার সার্থকতা কি আছে, কতটুকু আছে? একবারও ত' বলিলাম

না,—হে আমার সোণার স্বপ্ন ! তুমি তোমার সোণালি কিরণ লইয়া ইচ্ছা হইলে দূরে দূরেই আলেয়ার মত সরিয়া থাক, আমি তোমাতে প্রলুব্ধ নই, তোমাকে পাইবার জন্য আমি কাঁদিতে জানি না,—আলোকের সমারোহ লইয়া যদি তুমি আসিতে পার, যেদিন ইচ্ছা আসিও, আবার যেদিন ইচ্ছা মুক্ত হরষে চলিয়া যাইও,—আমি তোমাকে ভালও বাসিব না, তোমাকে ঘৃণাও করিব না, যেহেতু যাঁহার যোনিপীঠ বাহিয়া তুমি এখানে আসিয়া ছলায় কলায় পূর্ণ হইয়া অমন মোহিনী মাধুরীতে মন মাতাইতেছ, তাঁহার চরণকোণের অশোক স্পর্শ নির্ভুলরূপে আমি লাভ করিয়াছি। একদিনও ত' কহিতে পারিলাম না, হে আমার ঐ সকল সুখের শত্রু ! হে আমার সকল সাধের বাদ ! তোমার ঐ কট্‌মট্‌ রক্তচাহনি আরও উগ্র করিয়া প্রলয়কালের মেঘগর্জ্জনে নাচিতে নাচিতে আমার সুমুখে এস ; সূচীভেদ্য অন্ধকারে, আড়াল রচিয়া "আধ আচরে ব'স" তোমার যাইতে হয়, যখন ইচ্ছা তখন চলিয়া যাইও, থাকিতে হয়, অনন্তকাল অক্ষয় বটের মতন শত যোজন শাখা ছড়াইয়া পেচককণ্ঠের কটুকলরবে থাকিও,—আমি তোমাকে ভয়ও বাসি না, তোমার উচ্ছেদ-সাধনও আমার জীবনের মুলমন্ত্র নহে। ভীষণং ভীষণানাং আমার নিত্যকালের সিদ্ধি-দেবতা, তিনি কোমল কুসুমেও হাসেন, আবার বজ্র-অনলেও বিশ্বসৃষ্টি নিমেষ-মধ্যে নিষ্ঠুর ভাবে নাশেন,—তাঁহাকে অন্তরের

অন্তরে আপনারও আপন বলিয়া জানিয়া আমি শান্ত হইয়াছি স্নিগ্ধ হইয়াছি, সমাহিত হইয়াছি ; লক্ লক্ করিয়া আগুন জ্বলিলে, টগ্‌বগ্ করিয়া তপ্ত তৈল ফুটিলে আমি অশান্ত হই না, অস্থির হই না, অধীর হই না!

ভিতরে চুপ্ মারিয়া ডুব দিতে পারি নাই, তাই এখনও আমরা সুখদুঃখের অনুভব লইয়া নিজেদের মনের মাঝে চিত্ত-বৃত্তির বিষম দলাদলির সৃষ্টি করিয়া কুরুক্ষেত্রের সংহার-সমর লাগাইয়া দিয়াছি এবং সেই মারামারি, কাটাকাটি, ছুটাছুটি, লাঠালাঠির কোলাহলে ধৈর্য্য হারাইয়া, স্থৈর্য্য খোয়াইয়া শ্রান্ত ও শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছি। যে বায়ু যত উষ্ণ, সে বায়ু ততই বহির্ম্মুখ, ততই চঞ্চল, ততই হাল্কা।

চিরানন্দ।

অন্তরে বাহিরে যিনি ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান, তিনি ব্যতীত অপর কেহই বা অপর কিছুই চিরানন্দদায়ক নহে। জগতের সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, বন্ধু-শত্রু সকল একমাত্র তখনই চিরানন্দদায়ক হয়, যখন সাধকের চক্ষে তাহাদের অস্তিত্ব সেই বিশ্বসত্তায় বিলীন হইয়া যায়। যাহা চিরানন্দদায়ক, তাহা কখনও নিরানন্দে পর্য্যবসিত হয় না। চিরানন্দে নিরানন্দ নাই। যাহা শাশ্বত, তাহার পক্ষে ক্ষণস্থায়িত্ব কল্পনা করা যায় কি ?

নিরানন্দতা মানুষের ভ্রমের সন্তান। ভ্রমেই উহা জন্মে, ভ্রমেই উহা বাড়ে এবং ভ্রমেই উহা অটুট উর্দ্ধশীর্ষ রহে। ভ্রম ছুটিয়া গেলে, উহাও ভূমিতে লুটিয়া পড়ে।

যেন না ভুলি।

স্বার্থের পরদা যাহাদের চখের উপরে বিস্তারিত রহিয়াছে, অপরকে তাহারা নিজেদের গণ্ডীবদ্ধ বুদ্ধির পরিসর দিয়া বেড় পাইয়া উঠে না বলিয়াই, বোকা বলে, পাগল বলে, আরও কত কিছু বলে। জগতের বহির্ম্মুখ বিলাসিতাকে নশ্বর বলিয়া যাহারা জানিয়াছে, ভগবানকে যাহারা ভগবানের কাজের মধ্যেই পাইতে চলিয়াছে, নিঃসঙ্গতা তাঁহাদিগকে কোন্ ভয় দেখাইবে?—ভগবান্ যদি তাহাকে না ভোলেন, তবে জগৎশুদ্ধ লোক তাহাকে ভুলিয়া থাকিলেই বা কি যাইবে আসিবে? দুঃখকষ্টে শীর্ণ হইয়াও যেন ভগবানকে অবিশ্বাস না করি। তুষারের শিরে উষার কিরীটের মত তিনি যেন আমাদের চিরদারিদ্র্যের মধ্যেও চিরউজ্জ্বল হইয়া রহেন।

বহুরূপী ভগবান্।

প্রকৃতই ভগবান্ বিশ্বরূপ বা বহুরূপী। আমাদের কাছে তিনি বহুবার বহুরূপ ধরিয়া আসেন, আমরা তাঁহারই দেওয়া চক্ষের দীপ্তি দিয়া তাঁহাকে দেখি, তাঁহারই বহুবিকশিত শক্তি দিয়া বহুঘটে তাঁহাকে উপলব্ধি করি। কখনও তিনি আমাদের কাছে অরণ্যচারী মৃগশিশুর মত সবুজ ঘাসের উপর নাচিতে

নাচিতে আসিয়া রঙ্গকৌতুকে ধরা দেন, কখনও বা আমারই শস্তুসঙ্গী পাখীর মত গিয়া তাঁহার আপন হাতের পাতা জালের বন্ধনে নিরুদ্ধ ক্রন্দনে ধরা পড়ি। এই ধরাধরির মধ্য দিয়া সৃষ্টির বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য ক্রম-বিকশিত হইতেছে। কখনও তিনি পুণ্যরূপে আসেন আত্মপ্রসাদে আমাদের আত্ম-বিশ্বাসকে সুপ্রতিষ্ঠ ও স্বপ্রতিষ্ঠ করিতে, কখনও তিনি অকৃতিরূপে আসেন, তীব্র অনুশোচনার অশ্রুধারায় সংস্কারবর্দ্ধিত অন্ধ অজ্ঞানতাকে সকল মালিন্যসমেত দূর করিয়া দিতে। তিনি কামরূপী; তাই তিনি কামরূপে আসেন, ক্রোধরূপে আসেন, লোভরূপে আসেন, হৃদয়কে চকিত, মথিত, ব্যথিত করিয়া আপনারই স্নেহ-সদরে টানিয়া নেন। আবার তিনি আসেন সংযমের শুভ্র চন্দনে, ক্ষমার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায়, কর্ম্মের ঝঞ্ঝা-গর্জ্জনে। তিনি আসেন কল্পনার উচ্ছ্বসিত গানে, সঙ্গীতের নৃত্যময় বানে, প্লাবনের ধ্যানপ্লুত তানে। তিনি সুখে আসেন, দুঃখে আসেন; শোকে আসেন, সান্ত্বনায় আসেন; অভ্যুদয়ে আসেন, পরাজয়ে আসেন, জীবনে আসেন, মরণে আসেন।

(সমাপ্ত)

"পতিত, অধম, অনাথের লাগি'
পরাণ যাহার কাঁদে,
অমল-প্রীতির প্রসূন-মালায়
সে-ই ত আমারে বাঁধে।"

—স্বরূপানন্দ—

পরমকল্যাণীয়

শ্রীমান্ নকুলেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়

নিত্যনিরাপৎসু ঃ—

স্নেহের নকুল,

বাংলা ১৩২৬ হইতে ১৩৩৪ পর্য্যন্ত আমার কৃচ্ছ পূর্ণ কর্ম্ম-জীবনের ইতিহাস শুধু তুমিই জান। তুমিই তখন ছিলে আমার বিশ্বস্ত সহযোগী ও নিত্যসঙ্গী,—আমার শ্রমের ভাগ, অনশনের অংশ দ্বিধাহীন চিত্তে লইয়াছ। এই গ্রন্থের মধ্য দিয়া আজ তোমাকে সেইদিনকার স্মৃতিতে স্নেহাশীষ বর্ষণ করিতেছি। ইতি—

১লা বৈশাখ
১৩৫৩

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

সূচীপত্র